চে

গণপ্রকাশন

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন ১৪২৭

প্রকাশক
গণপ্রকাশন
১২৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মুদ্রণ
ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

প্রাপ্তিস্থান
প্যাপিরাস
আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ
২/২ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
তরফদার প্রকাশন
২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

আমেরিকায় প্রাপ্তিস্থান
মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

অনলাইন পরিবেশক
www.jerico-bd.com
www.rokomari.com

মূল্য: ৫০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-94812-9-4

CHE
Published by Gonoprokashon
124 Concord Emporium Shopping Complex
Katabon, Dhaka 1205
Contact: 01714110641, 01719870580

প্রকাশকের কথা

গুহাবাস পর্ব থেকে দীর্ঘ বাঁক-উপবাঁক পেরিয়ে মহাশূন্যে নতুন পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার পর্বে দাঁড়িয়ে মানব প্রজাতি নিজদেরকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে দাবি করছে। চিন্তা ও কাঠামোগত নানা উতকর্ষ ঘটলেও, পৃথিবীর পথে পথে অভুক্ত মানুষ, রক্তাক্ত হানাহানি, বৈষম্য, জীবন ও প্রকৃতি ধ্বংসকারী আগ্রাসী মানুষ–এও পৃথিবীর এক বড় বিপর্যস্ত চিত্র । পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের লালসায় পৃথিবীর এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মানুষের সংগ্রাম চলমান। ‘ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী’ সেই সংগ্রামের সহায়ক শক্তি। ‘ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী’ তার লড়াইয়ের অংশ হিসেবে ৫–১০ অক্টোবর ২০২০ পালন করছে ‘আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সপ্তাহ’। প্রতিবাদের এই সময়ে আমাদের সামনে উপস্থিত ৯ অক্টোবর। মানবিক ও শোষণহীন পৃথিবী বিনির্মাণের সংগ্রামে আজন্ম যোদ্ধা আরনেস্তো চে গুয়েভারার ৫৩তম মৃত্যু দিবস (১৪ জুন ১৯২৮–৯ অক্টোবর ১৯৬৭)। মহান এই বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও উত্তর প্রজন্মের কাছে তাঁর লড়াই-চিন্তার সাথে পরিচয় করানোর প্রয়াসে এই প্রকাশনা। চে’র বিপুল কর্মের পরিচয় তুলে ধরতে এই প্রকাশনা পর্যাপ্ত নয় বরং অর্ধশতাব্দী পরেও তিনি কিভাবে দারুণ প্রাসঙ্গিক–এই অধ্যায়ন হতে পারে তার প্রারম্ভিক ভাবনা মাত্র।

এই পুস্তিকাটিতে চে’র দুটি রচনার উপর পর্যালোচনা করেছেন আইজাজ আহমেদ এবং ভুমিকা লিখেছেন মারিয়া দেল কারমেন আরিয়েত গারসিয়া। ‘ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী’র উদ্যোগে এই পুস্তিকাটি একই সাথে ২০টিরও অধিক দেশে স্ব স্ব ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে ।

আমরা বাংলায় এটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত কমরেড বোরহান, তানভীর, শিনজিনি, অঙ্কিতা, সর্বজয়া ও মানোয়ার–সকলকে ধন্যবাদ।

চে’ সদা জাগুরুক থাক আমাদের প্রাত্যহিক লড়াইয়ে–এই প্রত্যাশা ।

মাহমুদুল হাসান মানিক

গণ প্রকাশন

সূচি

মারিয়া দেল কারমেন আরিয়েত গারসিয়া
আর্নেস্তো চে গুয়েভারা: সমাজতন্ত্র, আগামীদিনের
মানুষ এবং তৃতীয় বিশ্ব–৫

আইজাজ আহমদ
ভূমিকা–৯

আর্নেস্তো চে গুয়েভারা
ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা–১৭
কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ–৩১

আর্নেস্তো চে গুয়েভারার
বিপ্লবী জীবনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি–৪৭

মারিয়া দেল কারমেন আরিয়েত গারসিয়া*

আর্নেস্তো চে গুয়েভারা:
সমাজতন্ত্র, আগামীদিনের মানুষ এবং তৃতীয় বিশ্ব

চে'র বৈপ্লবিক অগ্রযাত্রায় ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সাল দুটি খুবই গুরত্বপূর্ণ; এই সময়েই যেমন চে'র কর্মযজ্ঞের একটি চূড়া নির্ধারণ হয়েছে তেমনি নতুন যুগেরও সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫৯ সালে কিউবা বিজয় এবং ১৯৬৫ সালে কঙ্গো ও বলিভিয়ায় আন্তর্জাতিক মিশন গ্রহণ করতে ১৯৬৫ সালে কিউবা ত্যাগের এই সময়কালে চে' তার চিন্তা ও কর্মের বিপুল স্বাক্ষর রেখে যান। এই সময়ের লেখাগুলিতে চে' কিউবান বিপ্লব বা তার অন্যান্য কার্যাবলীর অভিজ্ঞতার আলোকে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের বিষয়ে তার মতামত ও নির্দেশনা উপস্থাপন করেন। অধিকন্তু এখানে চে'র রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সার্বিক অভিজ্ঞতা এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এর উপর যে বিশদ অধ্যায়ন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়কালে অসংখ্য লেখা, প্রবন্ধ, বক্তব্য ও নির্দেশনা রয়েছে- যেখানে চে' নির্দিষ্ট করেছেন যে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর পথে কি উদ্দেশ্য, গতিপথ ও কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত। স্বাধীনতা ও মানবমুক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয় লক্ষ্যও তিনি দেখিয়েছেন । প্রায় সকল গরীব এবং অনুন্নত স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে। সকল ধরণের আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধারক হিসেবে একটি নতুন ধরণের মানবিক সমাজ গঠন হবে মনোযোগের ভিত্তিভূমি ।

১৯৬৪'র ডিসেম্বরে জাতিসংঘে দেয়া চে'র ভাষণ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো ১৯৬৫'র প্রথম দিকের সময়গুলো মূলত একটি পর্ব শেষ হবার পর আফ্রিকাজুড়ে চে'র অভিযাত্রার সূচনা। এই অভিযানে চে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের সান্নিধ্যে আসেন । ঐ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সংহতির দ্বিতীয় অর্থনৈতিক সেমিনারে চে' যে

*মারিয়া দেল কারমেন আরিয়েত গারসিয়া চে'র জীবন ও কর্মের উপর অন্যতম একজন গবেষক। তিনি চে'র স্ত্রী এলেইদা মার্চ এর নেতৃত্বে পরিচালিত চে গুয়েভারা স্টাডি সেন্টার (হাভানা) এর গবেষণা সমন্বয়ক।

বক্তব্য দেন তা অনেকের কাছেই ছিলো অনভিপ্রেত ও বিতর্কিত। তীব্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে তাঁর সুনির্দিষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করেন, পুঁজিবাদের সাথে এর দ্বন্দ্ব এবং তাদের জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ।

তাঁর এই বক্তব্যের সমালোচনা ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও সাম্প্রতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা তাকে সঠিক বলে প্রমাণ করে, যখন ঐক্য ও সংহতির অভাবে সমাজতন্ত্র ও বিভিন্ন মত-অবস্থানের অপূরণীয় ক্ষতি হতে দেখি। চে'র গৃহীত পথকে বুঝতে হলে আমরা দেখবো যে, কয়েক মাস পর নতুন একটি পর্ব শুরু করতে তাঁর সিদ্ধান্তটি প্রতিভাত হয় । মানুষের মুক্তির নতুন পর্যায়ের এই লড়াইকে বেগবান করতে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করলেন সেই 'চেষ্টা'কে পাশ না কাটিয়েই যেমনটি তিনি লিখেছেন- একবিংশ শতাব্দীর নতুন মানুষের সমাজ গঠনে সে সিদ্ধান্তসমূহ অবিচ্ছেদ্য নীতি হিসেবে থাকার কথা।

আলজিয়ার্সে চে'র বক্তব্যের নির্যাসের যৌক্তিকতায় ১৯৬৫ সালে 'কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ ' এবং ১৯৬৬ সালে 'ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা ঃ দুটি, তিনটি, অসংখ্য ভিয়েতনাম তৈরি কর' শিরোনামের দুটি তাত্ত্বিক রচনা সৃষ্টি হয়। 'কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ' রচনাটি ১৯৬৫ সালের ১২ মার্চ প্রথমবারের মতো উরুগুয়ের 'মার্চা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি লিখিত হয়েছিল চে' আলজিয়ার্সে থাকাকালীন যখন সে আলোচ্য বক্তব্যটি দেন । ঐ বছরের এপ্রিল থেকে নভেম্বরে চে' কঙ্গোর স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। নিজের অভ্যাস মতো চে' তাঁর কঙ্গোর অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেন 'কঙ্গো ডায়েরিঃ কঙ্গোর বিপ্লবী সংগ্রামের পর্ব'। সেখানে তিনি 'তিক্ত অভিজ্ঞতা'র কথা উল্লেখ করলেও নিজেদের সংগ্রামে সেখানকার জনগণের ত্যাগের অসামান্য উদাহরণ তুলে ধরছেন।

কঙ্গো ত্যাগ করে চে' একটি চতুর্মূখী অবস্থানে উপনীত হন। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি উভয় সংকট উপলব্ধি করলেও কঙ্গো ত্যাগ তাকে লাতিন আমেরিকার সামগ্রিক মুক্তির বিকল্প লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে স্থির করে। কিউবার বাইরে লড়াই করার এই সিদ্ধান্ত কারো অজানা ছিলো না। মেক্সিকোতে প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় থেকেই তিনি ফিদেলের নেতৃত্বে বাতিস্তা স্বৈরশাসকের পতনের জন্য লড়াইয়ের প্রতিশ্রুত ছিলেন । একই সাথে এও প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, কিউবা মুক্ত হওয়ার পর তিনি এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাবেন ।

একজন বিপ্লবী চে গুয়েভারা হয়ে উঠার জন্য ১৯৫৫-৫৬ সাল তাঁর জীবনের নতুন বাঁকের সূচনা করেছিলো। এই পর্বের ধারবাহিকতায় তিনি জনগণের সহায়তায় লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৫৯ সালে কিউবায় একটি প্রকৃত জনগণের বিপ্লবের অংশীদার হন। প্রাথমিক পর্যায়ে চে' ফিদেলের নেতৃত্বে চলছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা এবং কর্ম-প্রতিজ্ঞা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় মিলেমিশে তাকে একজন সমাজতান্ত্রিক হিসেবে গড়ে তোলে ।

বিপ্লবী কাজের প্রতি পরিপূর্ণ নিবেদন চে'কে বহু গুণ ও দায়িত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিলো। ফলে দরিদ্র ও নির্ভরশীল দেশগুলোতে বিদ্যমান সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ঐ দেশগুলো কিভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে পারে সেই চেষ্টা করতেন। এই উদ্দীপনা ও বহুমাত্রিক কর্মদ্যোগ তাকে সাহায্য করে একটি নতুন সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তিভূমি নির্মাণ করতে। চে'র অবদানকে মূল্যায়ন করলে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখযোগ্যভাবে চিহ্নিত করা যায়। (১) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গৃহীত নীতির আলোকে পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করে ধারাবাহিকতা ও সংহতি রক্ষা করা। (২) তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, যার প্রয়োগ ঘটে কিউবায়। জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুত লড়াইয়ে এই দ্বীপটি একটি উদাহরণযোগ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারতো।

চে'র এই ধারাবাহিক অনুশীলনই তাকে অনুপ্রেরণা দেয় কিউবা ছাড়ার আগে 'কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ' এই রচনাটি লিখতে। তিনি কিউবা ছাড়লেও ভুলে যান নি তাঁর নীতি, যার জন্য সে লড়াই করেছে। শুধু কিউবান বিপ্লব সংগঠিত করাই নয়, বরং অন্যান্য দেশকেও সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নিয়ে আসা ।

এটি কোনো সুযোগের বিষয় নয়, কিংবা তাঁর নাম ও অনুশীলনের বিষয়ও নয়। চে'র চিন্তার প্রাথমিক ফোকাসটি ছিল- বিষয় হিসেবে মানুষের কাজ ও প্রতিশ্রুতি, যেটির সে অংশ সেটির উপর মৌলিক ভুমিকা প্রতিষ্ঠা করা। চে'র মতে, মানুষ ও তার বস্তুগত প্রতিফলন তার সচেতন অনুশীলনের ফলাফল হিসেবে উঠে আসে। চে' তাঁর তত্ত্বের প্রথম পর্যায় থেকেই মার্ক্সের নীতিগুলো অনুসরণ করেন। মার্ক্সের মতো চে'ও একটি মৌলিক রূপান্তর চেয়েছেন । যেই রুপান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন হয়ে পুরোনো পুঁজিবাদী সমাজের বদলে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠবে ।

চে'র প্রতিফলিত কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে পরিষ্কার করে বলা যায়- তাঁর কর্মকান্ডসমূহ আরো ব্যাপক পরিসরে এগিয়ে নিতে হবে। তাঁর কর্মকান্ডের ঐতিহাসিকতাকে মাথায় রেখে চিহ্নিত বিপর্যয় ও সাফল্যকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মেনেই একে আরো উন্নত করা যায়। গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে, যে বিপর্যয় সামনে আসবে তাকে বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ করতে হবে তখন , যখন নিজেকে প্রয়োজনীয় ছাঁচে বা পুরো পরিস্থিতিকে ঐ ছাঁচে ফেলতে পারে- এমন কারো কাছ থেকে পরিকল্পনাটি আসবে।

কিভাবে নতুন সমাজ গড়া যায় এবং কিভাবে অন্যদের বোঝানো যায়- এটি সম্ভব ধারাবাহিকভাবে এই পথে চলতে গিয়ে চে' দেখাতে ভুলে যান নি মানুষের জীবিকার কঠিন পরিস্থিতি, কি শোষণের মধ্যে মানুষকে বাঁচতে হয় এবং পৃথিবীর সবচেয়ে অবহেলিত ও আশ্রয়হীন অঞ্চলের মানুষের বাস্তবতা। একটি অনুন্নত ও পরনির্ভরশীল পরিস্থিতি থেকে কিউবার সমাজতন্ত্রে উত্তরণ তার একটি উদাহরণ।

চে'র নতুন গন্তব্য হয়ে উঠলো তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব যেখানে প্রকৃত পরিবর্তনের আওয়াজ উঠেছিলো। চে' বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের এই সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে তুলতে পারলে তাদের বিজয় অর্জন করা সম্ভব। তবে এটি খুব সহজ ছিল না তখনো, এমনকি এখনো সহজ নয়। তবে বিজয় অর্জনের জন্য সম্ভাব্য শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করা গেলে এখনো তা সম্ভব । মূলত এই কথাগুলোই চে' আলজিয়ার্সে বলেছিলেন । এবং কঙ্গো ও বলিভিয়াতে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত বলিভিয়াতে চে'কে হত্যা করা হয় কিন্তু এই বলিভিয়াতেই নতুন সমাজের বীজ রোপিত হয়েছিলো, যেখান থেকে আরো সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার নেতৃত্ব তৈরি হবে।

এটিই ছিলো চে'র শেষ পর্যবেক্ষণের মূলকথা। যেগুলিকে একত্রিত করে তিনি লিখেছেন, 'ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা'। তাঁর সময়ের নির্মম যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এটি লিখিত হয়েছিলো। এখনো মানুষের মর্যাদা ও সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সে লড়াই চলমান।

মানুষ যে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গেছে তা দুঃখজনক। স্বাভাবিকভাবে মানুষ চে' কে পছন্দ করে। কিন্তু চে'র আদশের্র প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতাকে নিঃশেষ করতে বহু অপচেষ্টা করা হয়েছে । তারপরও চে'র চিন্তা ও কর্ম এখনো অবিচ্ছেদ্য উদাহরণ হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে বর্তমান প্রবন্ধ থেকে চে'কে বুঝবার এবং শেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। 'কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ' এবং 'ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা' একটি আরেকটির পরিপূরক। এগুলো মানুষের সংগ্রাম ও বিজয় পথের সমন্বিত রূপ। ঐক্য ও সংহতির আলোকে দেখলে এটি একটি সম্ভাব্য ও প্রকৃত কৌশলের প্রবহমানতার সূচনা, যেখানে বিপন্ন দেশগুলোর অমিত শক্তি যুক্ত হয়েছে।

মানুষের স্বাধীনতার আগ্রহ জাগাতে চে'কে ধারণ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকুক, যেখানে প্রতিবিম্বিত 'লড়াই ও বিজয়ের উদগ্রতা' আমাদের ভবিষ্যত স্বপ্নের সামর্থ্য সৃষ্টি করে।

★

আইজাজ আহমদ

ভূমিকা

'মানবতা হ'ল জন্মভূমি
– জোসে মার্তি

'আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানবকে তৈরি করব আমরা নিজেরাই।'
– চে গুয়েভারা

আর্নেস্তো চে গুয়েভারা (১৯২৮-১৯৬৭) দুটি অসাধারন রচনার লেখককে এখানে তুলে ধরব, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি মূলত ভবিষ্যতের কালজুড়ে তাঁর জীবনযাপন করেছিলেন এবং যিনি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যের দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বের বিরুদ্ধে স্থায়ী বিপ্লবী এবং বিশ্বের বৈপ্লবিক রূপান্তরের যোদ্ধা ছিলেন। তাকে পড়তে একটি বড় বাঁধা হ'ল তিনি ইতিহাসের এমন এক ক্ষণে জীবন কাটান ও মারা গিয়েছিলেন যা আমাদের বর্তমান সময় থেকে একদম আলাদা। তিনি এমন এক সময়ে ছিলেন যখন মানবতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাস করত এবং পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের/কমিউনিজমের মধ্যকার পদ্ধতিগত দ্বন্দ্ব ছিল প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশেই প্রবল হচ্ছিল। তাই বলা যায়, এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ যুগ যেখানে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ এবং কমিউনিজমের মধ্যে অন্তর্নিহিত সংযোগ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছিল সুস্পষ্ট। চে'র লেখাগুলোতে এমন একটা অনুভূতি রয়েছে যেন বিপ্লবী অতীত থেকে উৎসারিত বার্তাগুলো ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায় সকল প্রতিবন্ধকতা রুখে দিয়ে।

চে যখন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সমর্থকদের দ্বারা খুন হয়েছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৩৯ বছর। তার জীবন অধ্যয়ন করলে এরকম অনুভূতি হতে পারে যে উল্কার মতো ক্ষণস্থায়ী ও উজ্জল এক জীবন আবার একের মধ্যে কয়েকটি জীবন এক হয়ে মিশে গেছে। তিনি একজন চিকিৎসক হিসাবে প্রশিক্ষিত হচ্ছিলেন তবে চিকিৎসাবিদ্যা শেষ করার আগেই তিনি লাতিন আমেরিকার অনেক

জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। জন্মগতভাবে আর্জেন্টিনার নাগরিক চে তার সাময়িক আবাসস্থল গুয়াতেমালায় ১৯৫৪ সালে প্রথম অল্প বিস্তর/মোটামুটি পদ্ধতিগতভাবে মার্কসবাদকে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি প্রথম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিআই ও এর ভাড়াটে সৈনিক দ্বারা সংঘটিত অভ্যুত্থানের সময়ে প্রগতিশীল আরবেনজ সরকারকে রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় অস্ত্র তুলে নেন। পরে তিনি মেক্সিকোয় পালিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে ফিদেলের সাথে তার দেখা হয়েছিল এবং তার আস্থা অর্জন করেন ও কিউবার বিপ্লবের প্রতি আজীবনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। প্রাথমিকভাবে নির্বাসিত বিপ্লবীদের একজন চিকিৎসক হিসাবে যোগদান করে শীঘ্রই তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃস্থানীয় কমান্ডার হিসাবে আবির্ভূত হন এবং দ্রুতই এক কিংবদন্তিতে পরিণত হন-এবং গেরিলা যুদ্ধের ইতিবৃত্তে প্রধান তাত্ত্বিক- হয়ে ওঠেন। বিপ্লবের পরে চে বিপ্লবী সরকারে যেমন জাতীয় ব্যাংকের সভাপতি এবং শিল্পমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত দেশে কিউবার দূত হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক ফোরামে আলজিয়ার্স থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত দেশের মুখপাত্র হিসাবে সেবা দিয়েছেন। এইসকল ভ্রমণের একটা অংশ ছিল প্রকাশ্য ও সরকারি যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ, বহুপাক্ষিক জোটের দিকে চালিত হওয়ার আলোচনাসহ কূটনৈতিক ও বাণিজ্য আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল; আর অন্য গোপনীয় অংশটার লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিবিধ বিপ্লবী মোর্চা খোলা এবং সমন্বিত করা।

এই গোপনীয় ভ্রমণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্খি ছিল বলিভিয়ায় একটি বিপ্লবী যুদ্ধের সূচনা করে তা আর্জেন্টিনা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া যা মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল কারণ তাঁর গেরিলা ঘাঁটিতে গোপনে আক্রমণ করা হয় এবং যেখানে তিনি নিজেই সিআইএ-নেতৃত্বাধীন বলিভিয়ান আর্মি দ্বারা বন্দী ও খুন হন।

বাস্তবিক বিপ্লবী হিসাবে তিনি এই আলোড়নপূর্ণ জীবনযাপন করার পরেও একটি দুর্দান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন যার একটা অংশ এখনও স্প্যানিশ থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি। আমরা এখানে দুটি রচনা উপস্থাপন করছি যা তাঁর দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য এবং মেধার বিভিন্ন দিক চিত্রিত করে। প্রতিটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুও সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয়। যাইহোক, যে ধারণাগুলো এখানে প্রবল শক্তির সাথে প্রকাশ করা হয় তা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক রচনা সম্ভারে বেশ কয়েক বছর ধরে অঙ্কুরিত ছিল এবং সেগুলোর কিছু অনুমান পাওয়া যায় তার পূর্ববর্তী রচনা ও বক্তৃতার কয়েকটিতে, যেমন 'বিপ্লবী সংগঠনের সামাজিক আদর্শ' (১৯৫৯), কিউবা: উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম বা ভ্যানগার্ড? '(১৯৬১); 'বিপ্লবী ডাক্তার (১৯৬০),'একজন তরুণ কমিউনিস্ট হতে (১৯৬২), এবং আরও অনেক কিছু। প্রথমে শুরু করা যাক 'ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা' এর প্রেক্ষিত ও রূপরেখা দিয়ে। কিউবা ১৯৬৬ সালের

৩-১৫ জানুয়ারী হাভানাতে আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের সাথে সংহতির প্রথম সম্মেলন (Tricontinental সম্মেলন) আয়োজন করেছিল, সম্মেলনে ৮২ দেশের ৫২১ জন প্রতিনিধি ২৭০ এর বেশি অতিথি এবং পর্যবেক্ষক একত্রিত হয়েছিল। সম্মেলন শেষে ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের সংহতি সংগঠন (OSPAAAL) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার ফলস্বরূপ, Tricontinental বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল যা তিনটি মহাদেশের সকল অংশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সংবাদ প্রচার করেছিল এবং দ্বৈমাসিক তাত্ত্বিক মাধ্যম নিপীড়িত দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চিন্তাবিদদের লেখা প্রকাশের একটি ফোরাম হিসাবে কাজ করেছিল। মরোক্কার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারার মহান মার্কসবাদী মেহেদি বেন বারকা যিনি প্রথম Tricontinental সম্মেলনের আন্তর্জাতিক সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ছিলেন নিম্নলিখিত ভাষায় এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। হাভানায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের সভাটি ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ এটি ঐক্যমত্য ও সংহতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্ব বিপ্লবের দুটি বড় সমসাময়িক স্রোত একটি সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর এবং অন্যটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধারাকে ঐক্যবদ্ধ করবে কারণ এটি কিউবাতে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে উভয় বিপ্লব চলছে। এই প্রকাশনায় চে গুয়েভারের দুটি গ্রন্থকে একত্রিত করে আমাদের যুগের কমিউনিজম এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক সংযোগে একে অপরকে জড়িয়ে থাকা প্রতিচ্ছবি হিসাবে পড়া যেতে পারে। হাভানায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় চে আফ্রিকার বিপ্লবী সংহতি ও লড়াইয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি তার বার্তাটি এই সম্মেলনের জন্য নয়, ১৯৬৭ সালের ১লা এপ্রিলে প্রকাশিত জার্নালের একটি বিশেষ উদ্বোধনী সংখ্যার জন্য খসড়া করেছিলেন এবং যেখানে চে এটির শিরোনাম প্রকাশ করেছিলেন: ‘দুটি, তিনটি অনেক ভিয়েতনাম তৈরি কর; এটাই,পথনির্দেশক নীতি। অন্য রচনাটি ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে উরুগুয়ের ঐতিহাসিক ম্যাগাজিন মার্চায় ‘কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা’ রচিত হয়েছিল পুঁজি ও সাম্রাজ্য বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী উত্থানে সহযোগিতার একটি আহবান ‘সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা, পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়-এবং একে বৈশ্বক পর্যায়ে মোকাবেলা করে পরাজিত করতে হবে। আমাদের সত্যিকার প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদকে বিকশিত করতে হবে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে। অপর প্রবন্ধ, ‘কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ’ আংশিকভাবে কিউবার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রতিফলন, তবে এটা গভীরভাবে সাম্যবাদের মর্মার্থকে গুরুত্ব দেয় কেবল একটি প্রক্রিয়া হিসাবে উৎপাদন এবং শ্রেণি সম্পর্কের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নয় বরং মানুষ নিজেরই পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। চূড়ান্ত এবং সর্বাধিক বিপ্লবী আকাঙ্খা: মানুষকে তাদের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত দেখা। ব্যক্তি সামাজিক জীব হিসাবে সম্পূর্ণ চৈতন্য পৌঁছে যাবে যদি একবার বিচ্ছিন্নতার শৃঙ্খলাগুলো ভেঙে দেয়া যায় যা হবে জীব হিসাবে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধির সমতুল্য।

এটিকে নিখুঁতভাবে অনুবাদ করা হবে মুক্ত শ্রমের মাধ্যমে একজনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পুনরুদ্ধার। এই রচনার কয়েকটি অংশ পড়ে মনে হয় চে' ১৮৪৪ সালের মার্ক্সের পাণ্ডুলিপি থেকে পুনরায় লিখছেন অকপটতার সাথে যেন কিউবার বিপ্লবের প্রবল গতিশীলতার দ্বারা সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে এবং এটি কী শিক্ষা দিতে পারে, এর উদাহরণ, তিনটি মহাদেশের বিভিন্ন কোণে মুক্তির সংগ্রামকে উদ্ভাসিত করেছিল।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে প্রায় দুই দশক ধরে যে ধরণের 'শান্তি' বিরাজ করছিল তার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে 'ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা' শুরু হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বকে দুঃসাহসি আক্রমণ করেন সেই তত্ত্ব উল্লেখ না করে। তিনি স্বীকার করেছেন যে দুটি বৃহৎ পরাশক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএসআর-এর মধ্যে অবশ্যই যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু রচনার প্রথম অংশের অন্তর্নিহিত প্রশ্নটি ছিল বৃহৎ পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধের অনুপস্থিতি কি সত্যিই 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' নির্দেশ করে ? তদুপরি, সাম্রাজ্যবাদের সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদ কি নিজেই বিশ্বজুড়ে স্থায়ী যুদ্ধের শক্তি নয়? এই কারণেই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় অবিলম্বে শুরু হওয়া কোরিয়া যুদ্ধের বিষয়ে মন্তব্য দিয়ে তাঁর লেখা শুরু করেছিলেন এবং তিনি লিখেছেন 'জাতিসংঘের নিন্দিত পতাকা তলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নেতৃত্বে কয়েক ডজন দেশ এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। 'আমেরিকা এই যুদ্ধে প্রায় বিশ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছিল এবং ৩২,৫৫৭ টন নাপাম সহ মোট ৬৩৫,০০০ টন বোমা ফেলেছিল। চে যেমন ভিয়েতনাম সম্পর্কে তার মন্তব্য শুরু করার সাথে সাথে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি তিনটি ভিন্ন মহাদেশের তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি: ফ্রান্স, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা যোগ করতে পারি যে ভিয়েতনামে আমেরিকা যে পরিমাণ বোমা ফেলেছে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্ত পক্ষের দ্বারা বর্ষিত বোমার পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে। চে জোর দিয়েছিলেন যে 'যদিও বর্তমানে সমস্ত দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু ইন্দো-চীন উপদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল', তিনি উল্লেখ করেছেন যে অসংখ্য 'সংঘাতের মাঝে কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম হচ্ছে প্রধান উদাহরণ যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করছিল।

নিশ্চিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা আক্রমণ করেছিল এবং অন্যথায় তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকে এমন বর্বরতার সাথে ধবংসের চেষ্টা করছিল যে সাম্রাজ্যবাদীদের এই বৈশ্বিক কৌশল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুরূপ কিছুর সম্মুখীন করছিল, তৃতীয় বিশ্বের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে বৃহৎ পরাশক্তিরগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যুগ ছিল। এই যুক্তিটি নেতৃস্থানীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর একটি পাতলা পর্দাযুক্ত কিন্তু তিক্ত সমালোচনার দিকে পরিচালিত করে এবং ভিয়েতনামের পক্ষে তাদের সমর্থন দানের অপ্রতুলতাকে তুলে ধরে ও একই সাথে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে চীন-সোভিয়েত বিভক্ত হওয়ার কঠোর পরিণতিগুলোও পরিলক্ষিত হয়।

এই যুক্তির পংক্তিতে প্রথম অজুহাত একটি বিস্তৃত অনুযোগ আকারে আসে, যা সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছিল তবে বিশেষভাবে কাউকেই সম্বোধন করা হয়নি: ‘আগ্রাসনের শিকার ব্যক্তির সাফল্য কামনা করার বিষয়টি নয়, বরং তার ভাগ্য ভাগ করে নেওয়া; একজনকে অবশ্যই তাঁর মৃত্যুতে বা বিজয়ে অংশীদার হতে হবে। তবে তারপরে তিনি বিশদভাবে বলেছেন: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসনের জন্য দায়ী এর অপরাধ বিশাল এবং তা পুরো বিশ্ব জুড়ে। আমরা ইতিমধ্যে সব জানি, ভদ্রলোক! তবে এই অপরাধবোধ তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা ভিয়েতনামকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অলঙ্ঘ্য অংশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে দ্বিধা করেছিল- অবশ্যই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ঝুঁকি ছিল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। এবং এই অপরাধবোধ তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা যুদ্ধকে অপব্যবহারের এবং ফাঁদ হিসাবে বজায় রাখে যা বেশ কিছু সময় আগে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুটি সর্বশক্তিমান প্রতিনিধিদের দ্বারা শুরু হয়েছিল।

আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, একটি সৎ উত্তর চাই: ভিয়েতনাম কি বিচ্ছিন্ন, নাকি তা নয়? এটি কি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তির মধ্যে বিপজ্জনক ভারসাম্য বজায় রাখছে না?

প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি দ্বারা চে অবশ্যই ইউএসএসআর, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং চীন-সোভিয়েত বিভাজনকে বোঝাচ্ছেন যা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। এটি কেবল চে’ এর অবস্থান নয়। এর আগে, ১৯৬৫ সালে হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক্ষেপগুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, ফিদেল বলেছিলেন:

এমনকি উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আক্রমণগুলো সমাজতান্ত্রিক পরিবারের বিরাজমান বিভাজনকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এবং এই বিভাজন সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহিত করছে সন্দেহ করে কে? কে সন্দেহ করতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট তাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিত ও তাদের আরও নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের আগে তাদের আরও একটু সাবধানতার সাথে ভাবতে বাধ্য করত?

যদিও কিউবা নিজেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মারাত্মক হুমকির মধ্যে ছিল, ফিদেল এবং চে তাদের বিশ্বাস ও সাহস ছিল যে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভ্রাতৃত্ববাদী সমাজতান্ত্রিক দেশটির প্রতি ন্যায়বিচার এবং প্রয়োজনীয় সমালোচনা সংহতিতে ফাটল ধরাবে না। এই ভাবনার ধারা আগ্রাসনের শিকার কারো প্রতি কেবল প্রকৃত সংহতি নয়, আক্রান্তের সাথে লড়তে এবং তার কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার আগ্রহকে বোঝায়; যে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টচ প্রয়োজনীয় ছিল যদি ভিয়েতনামকে রক্ষা করা হত এবং সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বজুড়ে পরাজিত করা হত তখন চে’র ‘ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা’র মূল প্রতিপাদ্যে পৌঁছেছিল এবং তার সমর্থন ছিল: তাঁর দুটি, তিনটি অসংখ্য ভিয়েতনাম’।

tricontinental কনফারেন্স এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল: তিনটি মহাদেশ জুড়ে সমন্বিত বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের দর্শন যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে

ছড়িয়ে দিবে এবং যুদ্ধের জন্য ব্যয় চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে নিমজ্জিত করবে। এটি তার অর্থনৈতিক শক্তি নষ্ট করবে।

এই অগ্নিপরীক্ষা সহজ হবে না: এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চাগুলো তাদের মৃত্যু এবং তাদের অপরিসীম দুঃখ ভাগ করতে বাধ্য। বা এটিও ভাবা উচিত নয় যে এই মতামতগুলো বিশেষভাবে চে'র। ফিদেল tricontinental কনফারেন্সে তাঁর সমাপনী বক্তব্যে প্রায় অভিন্ন কিছু বলছিলেন: 'কিউবার বিপ্লবীদের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্র পুরো বিশ্বে। কিউবার যোদ্ধাদের পৃথিবীর যে কোনও কোণে বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। হাভানা ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বিপ্লবীর কর্তব্য হ'ল বিপ্লব সম্পন্ন করা, এবং কথায় না করে তা কার্যকর করা।'

চে এই রচনাটি লিখেছিলেন বলিভিয়ার প্রস্থান করার প্রাক্কালে ঠিক এমন একটি ফ্রন্ট খোলার জন্য, যা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল যে তিনি নিজের সংকল্পের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখছেন সুতরাং এটি একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিছু অন্ত্যেষ্টি গাথা যা আগাম তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন

নিম্নলিখিতটি কেবলমাত্র পূর্বাশঙ্কা হিসাবে পাঠ করা যেতে পারে:
(যদি) কোনও দিন আমাদের যে কোনও জমিতে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস নিতে হবে, যা ইতোমধ্যে আমাদের, আমাদের রক্ত দিয়ে সিক্ত, এটি জানা যাক যে আমরা আমাদের কর্মের পরিমাপ করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমরা কেবলমাত্র মহান সর্বহারা শ্রেণির যোদ্ধাদের অংশ হিসাবে বিবেচনা করি। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং মানবজাতির বড় শত্রু: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির একটি স্তবগান। মৃত্যু যেখানেই আমাদের চমকে দিতে পারে, সেটিকে স্বাগত জানানো যাক, তবে আমাদের সংগ্রামের আকুতির কিছুটা ধারণক্ষম কারো কাছে পৌঁছে যেতে পারে এবং অন্য হাতটি আমাদের অস্ত্র চালাতে প্রসারিত হতে পারে এবং অন্য কেউ অন্ত্যেষ্টি গাথা আবৃতি করার জন্য প্রস্তুত হবে, অন্য কেউ বিজয়ের ও নতুন যুদ্ধের ডাকে সারা দিতে প্রস্তুত হতে পারে।

চে' এর অন্য রচনা 'সমাজতন্ত্র এবং কিউবার জনগণ' এর প্রথম দুই পৃষ্ঠা, কিউবার বিপ্লব সম্পাদিত হওয়ার সাথে এবং একে বিশদভাবে স্পষ্ট করার সাথে সম্পর্কিত। বাকি সমস্ত বিপ্লবের কেন্দ্রীয় উদ্যোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয় ও কমিউনিজমের আলোচনা করা হয়। পূর্ববর্তী কিছু লেখায় চে' বরং কিউবা বিপ্লব এবং মার্কসবাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর 'প্রথম লাতিন আমেরিকান যুব কংগ্রেসের ভাষণে তিনি বলেছিলেন:

যদি এই বিপ্লবটি মার্ক্সবাদী হয়-এবং আমি মার্কসবাদী বলে ভালভাবে শুনি - কারণ বিপ্লবটি তার নিজস্ব পদ্ধতিতে মার্কস দ্বারা চিহ্নিত রাস্তাটি আবিষ্কার করেছিল। যদি আজ আমরা মার্কসবাদ হিসাবে পরিচিত যা কিছু অনুশীলনে রাখি, কারণ

এটি আমরা এখানে আবিষ্কার করেছি। মাও সে-তুং লিখিত একটি ছোট্ট পুস্তিকা আমাদের হাতে পড়ে। এখানকার লোকায়িত শক্তি ইতোমধ্যে লিখিত নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তক সম্পর্কে না জেনেই গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং কার্যপ্রণালী একনায়কতন্ত্রের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্বের অন্য প্রান্তে একই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেছে।

তাঁর 'কিউবার বিপ্লবের আদর্শ সম্বলিত নোট'এ তিনি লিখেছেন:
আমরা, প্রায়োগিক বিপ্লবীরা, বিজ্ঞানী মার্কসের দূরদৃষ্টিকে কেবলমাত্র আমাদের নিজস্ব সংগ্রাম শুরু করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করি, আমরা বিদ্রোহের এই পথ অতিক্রম করার সাথে সাথে আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সাথে নিজেদেরকে সমন্বয় করছি। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর নেতারা স্বাধীনভাবে এই মার্কসবাদের নীতিগুলো কীভাবে ব্যক্ত করেন বা পুরোপুরি জানেন তা কিউবার বিপ্লবের ঘটনাগুলোতে উপস্থিত রয়েছে।

এগুলো ছিল অসাধারণ ঘটনা। চে, ফিদেল এবং তাদের সাথীরা ছিলেন 'প্রায়োগিক বিপ্লবী' যারা সর্বহারা বিপ্লবের মার্কসবাদী তত্ত্ব বা মাওয়ের গেরিলা যুদ্ধের খুব কমই জানতেন যখন তারা তাদের গেরিলা যোদ্ধাদের একত্রিত করছিলেন এবং সর্বহারা বিপ্লবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন।

বরং এই বিপ্লবী চর্চা তাদের কাছে মার্কসবাদী তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ সত্যকে সুস্পষ্ট করেছিল।

'কিউবায় সমাজতন্ত্র ও মানুষ'-এ তিনি পশ্চিমা মার্ক্সবাদের এই প্রস্তাবের কড়া সমালোচনা করেন যেখানে বলা হয় উন্নত পুঁজিবাদের সমস্ত সহজাত সম্ভাবনা পূর্ণ হওয়ার পরে এবং তার নিজস্ব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরস্পর বিছিন্ন হলেই বিপ্লব সম্ভব। লেনিন ইতোমধ্যে পশ্চিমা মার্ক্সবাদের এই ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তত্ত্ব এবং দুর্বলতম সংযোগের মধ্য দিয়ে। বিপরীতভাবে, তিনি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় নিপীড়িত দেশগুলোতে বিপ্লবের অনেক বেশি সম্ভাবনা ছিল তা দেখান। তবে কিউবার মতো দরিদ্র, নিপীড়িত দেশে একবার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তারপরে কি সেখানে আবশ্যিকভাবে 'সমাজতান্ত্রিক আদিম পুঁজিভবন, সেই নীতি চালু করবে এবং উন্নত পশ্চিমের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত? বা, একটি ভিন্ন পথ অনুসরণ করা আবশ্যক?

এই লেখায় চে'র যুক্তি অনুসারে, ত্রিমহাদেশীয় বিপ্লবগুলো বাজির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে: যে শালীন, সমতাবাদী, মৌলিকভাবে কল্যাণকর এবং উদার সমাজ বাস্তবে তুলনামূলকভাবে নিম্ন উৎপাদন ও শিল্প সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে; যেহেতু প্রচলিতভাবে বোঝা যায় কেবল উৎপাদন সম্পর্ক এবং শক্তিকেই রূপান্তর করার চেষ্টা করা সম্ভব নয়, যাতে জনগণের সুরক্ষা, জনকল্যাণকর ও বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত পরিস্থিতি তৈরি

করা যায়, তবে পুঁজিবাদ যে মানবিক প্রকৃতির সম্ভাবনাগুলোকে বিকৃত এবং ধ্বংস করে তা পুনরুদ্ধারেও বিপ্লবসমূহ সহায়তা করতে পারে যা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং মানবিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে, সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম অপরাধটি হ'ল এটি মানবিক প্রকৃতিকেই বিকৃত করে, সামাজিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত সরলতাকে দমিত করে যা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দিক, এবং তার পরিবর্তে স্বার্থকেন্দ্রিক এবং অর্জন প্রয়াসী এমন ব্যক্তিদের তৈরি করে যারা অন্যের কল্যাণের প্রতি উদাসীন-পৃথিবীকে পরিণত করে এক দল বিচ্ছিন্ন মানুষের স্থান হিসাবে। চে'র দৃষ্টিতে, তিনি যাদেরকে 'নতুন নারী এবং পুরুষ' বলেছেন তারা পরস্পর সংযুক্ত ও মৌলিক সমাজতন্ত্রের প্রতি অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন যা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কেন্দ্রীয় কাজ।

তার রূপকল্পের এক প্রান্তে ছিল সমৃদ্ধির মৌলিক কাঠামো যা বৈষয়িক সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় যেগুলো ছাড়া অন্যের সাথে নৈতিক সংহতি সত্যিকার অর্থে খুবই দুরূহ যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদির সংস্থান, সহনশীলতার সামর্থ্য সম্পর্কে কিছু না বলা এবং কিউবার জনগণের বিরুদ্ধে চরম সাম্রাজ্যবাদী সহিংসতা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে বিকাশিত করা। এই রূপকল্পের অন্য প্রান্তে ছিল আন্তর্জাতিক সংহতি ও প্রতিশ্রুতি। তাই, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের দ্বান্দ্বিক অবস্থান নিয়ে কথা বলা।

★

ত্রিমহাদেশের প্রতি বার্তা

[অর্গানাইজেশন অফ দ্য সলিডারিটি অফ দ্য পিপল অফ আফ্রিকা, এশিয়া, অ্যান্ড লাটিন আমেরিকা (ওএসপিএএএএল) দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, হাভানা (কিউবা), ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৭]

বর্তমান সময় হল প্রজ্জ্বলিত চুল্লি এবং শুধুমাত্র আলোই দেখতে পাওয়া যাবে
– হোসে মার্তি

শেষ বিশ্বজোড়া অগ্নিকান্ডটি প্রশমিত হওয়ার পরে এর মধ্যে একুশ বছর পেরিয়ে গেছে; প্রায় সবকটি ভাষায় বহুসংখ্যক প্রকাশনা জাপানের পরাজিত হওয়ার দ্বারা প্রতীকায়িত এই বিশেষ ঘটনাটিকে উদযাপন করেছে। সমগ্র পৃথিবী যে কটি শিবিরে বিভক্ত তার অনেকগুলি অংশে আপাত সদর্থক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করা গেছে। চরম বিরুদ্ধতা, হিসাত্মক সংঘর্ষ ও আকস্মিক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের এই সময়কালে একুশ বছর ধরে কোনও বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ার সাপেক্ষে এই সংখ্যাটা বেশ ভারী। যাইহোক, এই শান্তিস্থাপনের ব্যবহারিক ফলাফলগুলি (দারিদ্র্য, অবক্ষয়, মানবসমাজের বড় অংশের প্রতি ক্রমাবর্দ্ধমান শোষণ) বিশ্লেষণ না করে যে শান্তিলাভের জন্য আমরা সকলে যুদ্ধ করতে রাজি হয়েছিলাম, ভালো করে খতিয়ে দেখা যাক যে এই শান্তি প্রকৃত ও যথার্থ শান্তি কিনা।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর থেকে যে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় চরিত্রের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে সেগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এই নোটগুলির উদ্দেশ্য নয়, এই আপাত শান্তির বছরগুলিতে ক্রমবর্দ্ধমান বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ বিবাদের বিস্তারিত বর্ণনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেবল এই অতিরিক্ত আশাবাদের বিপরীতে উদাহরণ হিসেবে কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের নামোল্লেখ করাই হবে যথেষ্ট।

প্রথমটিতে কয়েক বছর ধরে প্রচন্ড যুদ্ধ চলার পর দেশের উত্তরভাগ আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বিধ্বস্ততায় নিমজ্জিত হলঃ বোমায় ঝাঁঝরা, শিল্প, স্কুল, হসপিটাল নেই; ১০০ লক্ষ অধিবাসীর বসবাসের জন্য কোনও আশ্রয় নেই। ইউনাইটেড নেশনের পতাকার অবিশ্বস্ত পতাকার তলায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি নেতৃ ত্বের অধীনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল হস্তক্ষেপে কয়েক ডজন দেশ এই যুদ্ধে

যোগ দিয়েছিল এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছিল। অন্যদিকে সৈন্যবাহিনী ও কোরিয়ার জনগণ ও পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার স্বেচ্ছাসেবীরা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত ও তাদের থেকে উপদেশ পাচ্ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকার বিধ্বংসী অস্ত্র, থার্মো-নিউক্লিয়ার জাতীয় ব্যতিরেকে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জীবাণু ও রাসায়নিক যুদ্ধ পরীক্ষা করেছিল।

ভিয়েতনামে সেখানকার দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি প্রায় অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেঃ জাপান, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণের পরে প্রায় যার প্রায় উল্লম্ব বরাবর পতন ঘটছিল; ফ্রান্স, যে পরাজিত দেশটির থেকে নিজের ইন্দো-চায়না উপনিবেশগুলি উদ্ধার করে নিয়ে কঠিন সময়ে করা প্রতিজ্ঞাগুলি রক্ষা করতে অস্বীকার করল, এবং এই লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

প্রতিটি মহাদেশে সীমিত বা নিয়ন্ত্রিতভাবে সংঘর্ষ চলছিল, যদিও আমাদের আমেরিকায়, দীর্ঘ সময় জুড়ে চলছিল কেবল প্রারম্ভিক মুক্তি যুদ্ধ ও মিলিটারি অভ্যুত্থান ততদিন অব্দি যতদিন না কিউবার বিপ্লব ঘন্টা বাজিয়ে এই অঞ্চলের গুরুত্বের কথা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিল। এই কার্যকলাপে সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষুব্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কিউবা প্রথমে প্লায়া জিরন এবং আবার মিসাইল সঙ্কটের সময়ে নিজস্ব উপকূলকে রক্ষা করেছিল।

কিউবার প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের মধ্যে যদি সংঘর্ষ শুরু হত তবে শেষ ঘটনাটির ফলে এক ধারণাতীত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটত।

কিন্তু স্পষ্টতই, সমস্ত দ্বন্দ্বের মূল বিন্দু হল বর্তমানে ইন্দো-চায়না ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলির দ্বীপাঞ্চল। লাওস এবং ভিয়েতনাম এক গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন, যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তি নিয়ে প্রবেশ করায় সমগ্র অঞ্চলটি এক বিপদজনক বিস্ফোরকে পরিণত হয়েছে যা যেকোনও মুহূর্তে ফেটে পড়বে।

ভিয়েতনামে এই সংঘর্ষ তীব্র জটিল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের কথা মনে রেখে সেগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

১৯৫৪ সালে দিয়েন-বিয়েন-ফু'র সম্পূর্ণ বিধ্বংসী পরাজয়ের পর জেনেভায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে দেশটিকে দুটি আলাদা আলাদা খন্ডে ভাগ করা হয়; ভিয়েতনাম কাদের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত এবং দেশটি কীভাবে পুনরায় একীভূত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ১৮ মাসের একটি টার্মের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই ডকুমেন্টে সই করেনি এবং কৌশল অবলম্বন করে ফরাসীদের হাতের পুতুল সম্রাট বাও-দাইয়ের বিকল্প হিসেবে এই স্বার্থে আরও সহায়তাপূর্ণ কাউকে উপস্থিত করার চেষ্টা করতে শুরু করে। ইনি হলেন ন-দিন-দিয়েম যাঁর ট্রাজিক পরিণতি- সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে

নিষ্পেষিত হয়ে শুষ্ক হয়ে যাওয়া একটা কমলালেবু'র মত- সকলেই এ বিষয়ে জানেন।

এই চুক্তির পরবর্তী কয়েকটি মাসে জনপ্রিয় শক্তিসমূহের শিবিরে আশাবাদ কায়েম রইল। দেশের দক্ষিণে ফরাসী-বিরোধী প্রতিরোধের যে কটি পকেট অবশিষ্ট ছিল সেগুলি ভেঙে ফেলা হল এবং তারা জেনেভা চুক্তি কাজে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু দেশপ্রেমীরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যতক্ষণ না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভোটে নিজেদের ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করছে যা যাবতীয় প্রতারণা অবলম্বন করেও কার্যত অসম্ভব ততদিন পর্যন্ত কোনও নির্বাচন হবে না। আবারও দক্ষিণে লড়াই শুরু হল এবং ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করল। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রএর সৈন্যবাহিনি আক্রমণকারীর সংখ্যা বাড়িয়েছে পাঁচ লক্ষেরো বেশি যেখানে হাতের পুতুল হয়ে থাকা শক্তিগুলি সংখ্যায় কমে গেছে এবং তার উপরে সম্পূর্ণভাবে তারা প্রতিরোধক্ষমতা হারিয়েছে।

প্রায় দু বছর আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণের যুদ্ধ পরিস্থিতিকে পরাহত করার আরেকটি চেষ্টায় এবং শক্তিশালী অবস্থান থেকে সম্মেলনের টেবিলে একটি মিটিং জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামের ওপরে পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুযায়ী বোমাবর্ষণ শুরু করে। প্রথমে এই বোমাবর্ষণগুলি ছিল কম-বেশি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং উত্তরের উস্কানির অভিযোগ ও তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার দাবীর মুখোশে ঢাকা। পরবর্তীকালে এগুলি আরও নিয়মিত হয়ে উঠল এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পেল ক্রমে তা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বায়ুসেনার দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ আক্রমণে পরিণত হল, দিনের পর দিন এই আক্রমণ চলল দেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলার উদ্দেশ্যে। এটা ছিল কুখ্যাত 'এসকেলেশন' -এর একটি অধ্যায়।

ভিয়েতনামের বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক আর্টিলারির অবিরাম প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করেও ইয়াঙ্কি বিশ্বের এই স্থূল বিষয়বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ মাত্রায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে, অজস্র বিমান ধ্বংস হয়েছিল (১৭০০'র বেশি) এবং যুদ্ধখাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যোগান সরবরাহ করেছিল।

দুঃখজনক বাস্তবতা হলঃ ভিয়েতনাম-একটি দেশ যা ভুলে যাওয়া মানুষদের সমগ্র পৃথিবীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে-ট্রাজিক্যালি একা। এই জাতিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি'র ভয়াবহ আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে কার্যত দক্ষিণে কোনও প্রতিশোধ বা প্রত্যুত্তর ছাড়া এবং কেবল উত্তরে খানিকটা প্রতিরোধ ছিল- কিন্তু মূলত একা।

পৃথিবীর সবকটি প্রগতিশীল শক্তির ভিয়েতনামের মানুষদের পক্ষে সংহতি জানানো আজ অনেকটা রোমান এরেনায় গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রতি প্লেবেইয়ানদের খোশামোদির হাস্যকর তিক্ততার অনুরূপ। যে আগ্রাসনের শিকার তাকে কেবল সাফল্যের শুভেচ্ছা জানানোয় কিছু যায় আসে না, গুরুত্বপূর্ণ হল তার পরিণতিকে ভাগ করে নেওয়া; তার মৃত্যু বা তার জয়ে তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

আমরা যখন ভিয়েতনামের জনগণের এই সঙ্গীহীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে যাই, মানবতার এই যুক্তিহীন মুহূর্তে এসে যন্ত্রণা ও মনস্তাপে অভিভূত হয়ে পড়ি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসনের অপরাধে অপরাধী-এর অপরাধগুলি সাংঘাতিক এবং গোটা পৃথিবী জুড়ে ন্যস্ত। আমরা তা ইতিমধ্যেই জানি। কিন্তু এই একই অপরাধের ভাগী তাঁরাও যাঁরা যখন যথার্থ সময় এসে উপস্থিত হল তখন ভিয়েতনামকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন; এবং এই অপরাধের দায়ভার রয়েছে তাঁদের ওপরেও যাঁরা অপব্যবহার ও প্রলোভনের যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন-বেশ কিছুট সময় আগে থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুই সর্ববৃহৎ শক্তির প্রতিনিধিদের দ্বারা এর সূত্রপাত।

আমাদের অবশ্যই নিজেদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে হবে, সৎ ও যথার্থ উত্তর চাইতে হবে ঃ ভিয়েতনাম কি বিচ্ছিন্ন, অথবা বিচ্ছিন্ন নয়? তা কি দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যবর্তী বিপদজনক ভারসাম্যকে রক্ষা করছে না?

কী মহৎ এইসব মানুষেরা! তাদের প্রবল সাহস ও স্টোয়সিজম এবং তাদের এই লড়াই গোটা পৃথিবীকে কতকিছু শেখালো! খুব বেশি সময় আমরা জানতে পারব না যে রাষ্ট্রপতি জনসন কখনও আদৌ গুরুত্ব সহকারে জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত করার কথা ভেবেছিলেন কিনা-প্রতিনিয়ত বিস্ফোরক ক্ষমতা নিয়ে যে শ্রেণি দ্বন্দ্ব জ্বলন্ত আকার ধারণ করছে তাকে মসৃণ করে রাখার উদ্দেশ্যে। সত্যিটা হল 'গ্রেট সোসাইটি' নামের এই আড়ম্বরপূর্ণ শিরোনামের তলায় যে উন্নতিগুলির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তা ভিয়েতনাম নামের কুন্ডে নিক্ষেপিত হয়েছে।

বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি নিজেদের মধ্যে টের পাচ্ছে এই রক্তক্ষরণ যা ঘটিয়েছে একটি দরিদ্র অনুন্নত দেশ; তার প্রকান্ড অর্থনীতি যুদ্ধ প্রচেষ্টার চাপ টের পাচ্ছে। হত্যার একচেটিয়া সুবিধেজনক ব্যবসা স্থগিত হল। আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র, তাও আবার কখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে নয় এটুকুই ছিল এই অসাধারণ সৈন্যদলের সম্বল-এছাড়া ছিল নিজের দেশ ও সমাজের জন্য ভালোবাসা এবং অতুল পরিমাণে সাহস। কিন্তু ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ নিমজ্জিত হচ্ছে, কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না এবং প্রবলভাবে চাইছে এমন কোনও রাস্তা খুঁজে বার করতে যাতে এখনকার এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে নিজেকে উদ্ধার করা যায়। তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে চারটি ও পাঁচটি পয়েন্ট দাখিল করায় সামাজ্যবাদ আরও কোনঠাসা হয়েছে যার ফলে এই বিরোধ আরও নিশ্চিত ও অবধারিত হয়ে উঠেছে।

এই অস্থিতিশীল শান্তি যাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে তার একমাত্র কারণ হল কোনও বিশ্বব্যাপী বিধ্বংসী কান্ড সংঘটিত হয়নি, তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অ-গ্রহণযোগ্য এবং অ-প্রত্যাহারযোগ্য পদক্ষেপের ফলে পুনরায় বিনষ্ট হওয়ার বিপদের মুখে।

আমরা, পৃথিবীর শোষিত মানুষেরা এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করব? তিনটি মহাদেশের মানুষ তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে ভিয়েতনামের ওপরে এবং প্রয়োজনীয় পাঠ নেবে। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে মানবতাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়, তাই সুবিবেচিত প্রতিক্রিয়া হল যুদ্ধকে ভয় না পাওয়া। জনগণের সাধারণ কৌশল হওয়া উচিত সর্বক্ষেত্রে যেখানেই সংঘর্ষ রয়েছে সেখানেই ক্রমাগত প্রতিরোধ ও আক্রমণ জারি রাখা। সেইসমস্ত পরিসরে যেখানে আমাদের এই অতি অল্প শান্তিটুকু লজ্ঘিত হবে সেখানে আমাদের কী কর্তব্য? যেকোনও মূল্যে নিজেদের স্বাধীন ও মুক্ত করা।

গোটা দুনিয়ার বিস্তৃত চিত্র বা প্যানোরামাটি অত্যন্ত জটিল। প্রাচীন ইওরোপের কিছু দেশে এখনও মুক্তির লড়াই শুরু হয়নি, পুঁজিবাদের অসঙ্গতি উপলব্ধি করবার মত পরিণতি অর্জন করেছে কিন্তু এখনও দুর্বল তাই সাম্রাজ্যবাদকে অনুসরণ করতেও অক্ষম অথবা নিজস্ব পথে পা বাড়াতেও অপারগ। তাদের অসঙ্গতি বা দ্বন্দ্ব আসন্ন বছরগুলিতে একটি বিস্ফোরক স্তরে পৌঁছবে-কিন্তু তাদের সমস্যা ও ফলস্বরূপ তাদের নিজস্ব সমাধান আমাদের নির্ভরশীল ও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলির চাইতে ভিন্ন।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বুনিয়াদী ক্ষেত্রটি তিনটি অনুন্নত মহাদেশ নিয়ে গঠিতঃ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা। প্রতিটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু প্রতিটি মহাদেশ, সামগ্রিকভাবে একধরনের ঐক্যকে উপস্থাপিত করে।

আমাদের আমেরিকা একগুচ্ছ কমবেশি সমপ্রকৃতির দেশ সমন্বিত। বেশিরভাগ অংশে আমেরিকান একচেটিয়া পুঁজি অবাধ আধিপত্য বজায় রাখে। জড়পুত্তলির মত সরকার বা খুব বেশি হলে দুর্বল ও ভীরু স্থানীয় শাসকরা তাদের ইয়াঙ্কি প্রভুদের আদেশ অমান্য করতে অক্ষম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রায় ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গিয়েছে; এর থেকে আর বেশি এগোনো প্রায় সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে যে কোনো পরিবর্তন অবস্থার অবনতি ঘটানোর মত ধাক্কা দিতে পারে। ওদের নীতি হল ইতিমধ্যেই যা দখল করা গেছে তাকে রক্ষা করা। বর্তমানে কর্মপদ্ধতি হল কেবল সৈন্যবাহিনীকে নির্মম ভাবে ব্যবহার করা যাতে মুক্তি আন্দোলনগুলিকে ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, সেগুলির ধরন বা প্রকৃতি যাই হোক না কেন।

'আমরা আরেকটা কিউবা গঠন হতে দেবো না'—এই স্লোগানটি আদতে কোনোরকম প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা'কে গোপন করে, ঠিক যেমন পূর্বে ডমিনিকান রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, অথবা আরেকটু পিছিয়ে গেলে আমরা দেখবো পানামায় ঘটা হত্যাকান্ড। এর পাশাপাশি স্পষ্ট সতর্ক বার্তাও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইয়্যাঙ্কি সেনাবাহিনী যে কোনো মুহূর্তে আমেরিকার যেকোনো জায়গায় হস্তক্ষেপ করতে পিছুপা হবে না যদি তারা লক্ষ্য করে যে বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে, ফলে তাদের স্বার্থও

বিপন্নতার মুখে। এই নীতি প্রায় চূড়ান্ত দায়মুক্তি ভোগ করে : ওএএস এক্ষেত্রে মাস্ক হিসেবে যথাযথ ভাবে সফল : তার জনপ্রিয়তা কম থাকা সত্ত্বেও ইউএনের দক্ষতার অভাব হাস্যকর এবং দুঃখজনকও বটে। আমেরিকার সবকটা দেশের সেনা প্রস্তুত হস্তক্ষেপ করতে : যাতে সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। দ্য ইন্টারন্যাশনাল অব ক্রাইম অ্যান্ড ট্রিজন ও সংগঠিত করা হয়েছে। আরেকদিকে, স্বতঃস্ফূর্ত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে ----অবশ্য সে ক্ষমতা যদি তাদের হাতে থাকতো ও --- আর তারা পরিণত হয়েছে প্যাকের সর্বশেষ কার্ডে। আর কোনো বিকল্প পরে নেই–হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয় মনগড়া বিপ্লব।

এশিয়া এমন একটা মহাদেশ যার বিভিন্নধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটানা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার ফলে এশিয়ায় কমবেশি প্রগতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাদের স্বল্প বিবর্তন জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের প্রাথমিক লক্ষ্য কী হতে পারে তার গভীর ধারণা স্পষ্ট করেছে, এবং বাকিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা সাম্রাজ্যবাদি অবস্থান গ্রহনের পথে পা বাড়িয়েছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে গেলে, এশিয়ার কাছ থেকে ইউনাইটেড স্টেটসের যতটা না হারানো আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছো লাভ করার। এশিয়ার এই পরিবর্তনে তাদের স্বার্থ উপকৃতই হয়েছে। আশপাশের নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন করে ক্ষেত্র তৈরির সংগ্রাম তারা পরিচালনা করতে লাগলো জাপানের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি কখনো মাঝেমধ্যে।

কিন্তু বিশেষ কয়েকটা রাজনৈতিক শর্ত আছে, বিশেষত ইন্দো-চীনের ক্ষেত্রে যার দ্বারা এশিয়ায় মূলধন গুরুত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় যা সমগ্র মার্কিন কৌশলের একটি সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে।

এই সাম্রাজ্যবাদীরা চীন ঘেরাও করে অন্তত দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের মাধ্যমে।

এই দ্বৈত পরিস্থিতি, কৌশলগত আগ্রহ এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেনাবাহিনীর দ্বারা পিপলস রিপাবলিক অব চায়না'এর ঘেরাও, পাশাপাশি রমরমা বাজারের অনুপ্রবেশ, যা তারা তখনো আয়ত্ত করা শুরু করেনি–এশিয়াকে আজ পরিণত করেছে বিশ্বের অন্যতম বিস্ফোরক বিন্দুতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধক্ষেত্র'কে বাইরে রেখে এশিয়ার আপাত দৃশ্যমান স্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও।

মধ্যপ্রাচ্যের নিজস্ব বৈপরীত্য রয়েছে এবং সে বিস্ফোরক সম্ভাবনাময় হয়ে রয়েছে, যদিও তার ভৌগলিক অবস্থান এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সমর্থিত ইজরায়েলের সঙ্গে ওই অংশের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলোর ঠান্ডাযুদ্ধ ঠিক কতদূর ওব্দি চলবে তার পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব। এটা পৃথিবীর বুকে আরেকটা আগ্নেয়গিরি যার বিস্ফোরণের আশঙ্কায় সবাই ত্রস্ত।

আফ্রিকা নব্যঔপনিবেশিক দখলের জন্যে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল সরবরাহ করেছে। কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যা কিছুটা জোর করেছে এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোকে তাদের পুরোনো নিরঙ্কুশতটাটি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো যখন কোনোরকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই ঘটে চলে, উপনিবেশিকতা আর নব্য উপনিবেশিকতার মধ্যে কোনো ফসরাক থাকে না। অর্থনৈতিকভাবে তখন নব্য উপনিবেশিকতার সাজেই উপনিবেশিকতা তার শোষণ চালিয়ে যায়।

এই অঞ্চলে ইউনাইটেড স্টেটস'এর দখলে আগে কোনো কলোনি গঠন হয়নি কিন্তু এখন তারা আপ্রাণ লড়াই চালাচ্ছে অন্যান্য অংশীদারদের তসকর দখল করতে। এরম বলা যেতে পারে যে US সাম্রাজ্যবাদের কৌশলগত পরিকল্পনা অবলম্বন করে আফ্রিকা তার দীর্ঘ পরিসরের ক্ষমতার জলাধার তৈরি করেছ; যদিও তার বর্তমান বিনিয়োগ শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নের জন্য একমাত্র মূল্যবান এবং এই অনুপ্রবেশের আঁচ কঙ্গো, নাইজেরিয়া এবং অন্যান্য দেশেও পাওয়া যাচ্ছে যেখানে ক্ষমতা দখলের তীব্র এবং হিংগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ছড়াচ্ছে (বর্তমানে এর আকার এবং পদ্ধতি প্রশান্ত)

এখনো পর্যন্ত এখানকার একচেটিয়া ব্যবসাগুলোর বিশাল লাভ বা কাঁচামালের বড়োসড়ো মজুদগুলোর অস্তিত্ব সনাক্ত করে বিশ্বের প্রতিটি কোনা হস্তক্ষেপের ভান করার অধিকার ব্যতীত রক্ষার পক্ষে বিশেষ আগ্রহ নেই।

এই সমস্ত অতীত ইতিহাস মাথায় রেখেই এই শোষণের থেকে জনগণের মুক্তির সম্ভাবনার জন্য দীর্ঘ সময়ে ধরে বা কম সময়েই আমাদের সংগ্রামের উদ্বেগকে ন্যায়সঙ্গত করে।

যদি আমরা আফ্রিকার চিত্র বিশ্লেষণ করা বন্ধ করে দিই, আমরা দেখবো যে গিনি, মোজামবিক এবং অ্যাঙ্গোলায় অবস্থিত পর্তুগিজ কলোনিগুলোতে মুক্তির সংগ্রাম বেশ আপেক্ষিক তীব্রতার সাথেই রত হয়, এবং এই সংগ্রামে জয়লাভও করেছে প্রথম দেশটি, পাশাপাশি বাকিদুটো দেশেও পরিবর্তনশীল সাফল্য দেখা গেছে। আমরা এখনো দেখি কঙ্গোতে চলা অবিরাম সংঘাত লুলুম্বার উত্তরসূরী এবং শম্বে'এর পুরোনো সহকর্মীদের মধ্যে। এই বিতর্ক ও সংঘাত বর্তমানে শম্বের পক্ষে লাভবান হয়েছে : তারা নিজেদের সুবিধার খাতিরে দেশের একটি বড়ো অংশ'কে 'শান্ত করেছে'–যদিও আসলে যুদ্ধ এখনো প্রচ্ছন্ন।

রোডেশিয়ায় আমাদের সমস্যা আরেকটু অন্য ধাঁচের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরা শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের হাতে ক্ষমতা রাখার জন্য তাদের সাধ্যের মধ্যে সমস্ত উপায় ব্যবহার করেছে এবং বর্তমানে সেই শ্বেতাঙ্গরাই অবৈধভাবে এই ক্ষমতার অধীনে। ব্রিটিশের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংঘাত অন্যায় এবং অসরকারি; এই পশ্চিমি শক্তি তাদের স্বভাবত কূটনৈতিক চাতুরতা বজায় রেখেছে–যাকে আমরা কঠিন অর্থো বলতে পারি ভন্ডামি–ইয়ান স্মিথের সরকার গৃহীত পদক্ষেপের সামনে অসন্তুষ্টির

মোড়কে এর উপস্থাপনা দেখা যায়। এই সুসজ্জিত এবং কৌতুকপূর্ণ মনোভাবকে কিছু কমনওয়েলথ দেশ সমর্থন এবং অনুসরণ করে। তারা তীব্র বিদ্বেষ ও সমালোচনার মুখোমুখিও হয় একটা বড়ো অংশের দেশের কাছ থেকে, মূলত কৃষাঙ্গ আফ্রিকার অংশটা, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তোষণকারি হোক বা না হোক।

এই দেশপ্রেমিকদের বিদ্রোহী প্রচেষ্টা যদি সফল হয় এবং এই আন্দোলনে যদি প্রতিবেশী আফ্রিকান দেশগুলোও কার্যত সমর্থন জানায়, তাহলে রোডেশিয়ার পরিস্থিতি ভয়ানক বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই সমস্যার আলোচনা হচ্ছে UN, Commonwealth এবং OAU'র মতো নিরাপদ এবং ক্ষতিহীন সংগঠনগুলোতে।

আফ্রিকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তন আমাদের কখনোই একটা মহাদেশীয় বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখায় না। পর্তুগিজ শাসনের বিরুদ্ধে চলা মুক্তির সংগ্রাম অবশ্যই বিজয়ী হোক কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের এই শোষণের মাঠে পর্তুগাল কিছুই না। বিপ্লবী গুরুত্বের প্রসঙ্গে দ্বন্দ হ'ল সেগুলোই যেগুলো চোখের সামনে সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রপাতি তুলে ধরবে। এর মানে এটা নয় যে সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া অন্যান্য শোষণ থেকে মুক্তির লড়াই, অর্থাৎ পর্তুগিজ কলোনির থেকে মুক্তির সংগ্রাম'কে খাটো করে দেখা হবে। পর্তুগিজের দখলে থাকা তিনটে কলোনি এবং তাদের মুক্তির সংগ্রামে বিপ্লব আরো গভীর ভাবে প্রয়োজন।

দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ যখন তাদের ন্যায্য, খাঁটি বিপ্লব শুরু করবে, আফ্রিকায় একটা নতুন যুগের উদয় হবে। অথবা, কোনো দেশের সমগ্র জাতি যখন তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার লড়াইয়ে নামবে, সেখানের ক্ষমতাসীন উচ্চবিত্তের হাত থেকে, একটা নতুন যুগের সূচনা হবে।

এখনো পর্যন্ত, সেনাবাহিনীরা একে অপরে অনুসরণ করে; একদল অফিসার অন্য দল'কে ছাপিয়ে যায় অথবা এমন কোনো শাসককে তারা প্রতিস্থাপন করে যে তাদের গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার ভার নিতে অচল, অথবা গোপনে তাকে পরিচালিত করার জন্য ক্ষমতাধারি ব্যক্তিদের আর ব্যবহার করে না, তবে এর দুর্দান্ত জনপ্রিয় উত্থান নেই। কঙ্গোয় এরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিলো স্বল্প সময়ের জন্যে, লুলুম্বার স্মৃতি দ্বারা উৎপাদিত হয়ে, তবে শেষ ক'মাসে তারা শক্তি হারিয়েছে।

এশিয়ায় আমরা দেখেইছি যে পরিস্থিতি বিপজ্জনক ও বিস্ফোরক। ঘর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু শুধুমাত্র ভিয়েতনাম আর লাওসের যুদ্ধক্ষেত্র নয়; কামবোডিয়াও এই পরিস্থিতির শিকার। সেখানে যেকোনো সময়ে US'এর সরাসরি আগ্রাসন নেমে আসতে পারে। এমনকি থাইল্যান্ড, মালায়া এবং অবশ্যই ইন্দোনেশিয়া, যেখানে কোনো শেষ কথা উল্লিখিত হয়নি তার অবস্থান নিয়ে, কম্যুনিস্ট পার্টির নির্মুল হওয়ার পরও, যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা দায়িত্বে আসে। এবং, অবশ্যই, মধ্যরাচ্য তো রয়েছেই।

লাতিন আমেরিকায় সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে গুয়াতেমালা, কলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং বলিভিয়ায়; ব্রাজিলে এই বিপ্লবের ফুলকি উঠছে এখন। কিছু বিরোধী শক্তি মাথা চারা দেয় আবার উবে যায়। কিন্তু এই মহাদেশের প্রায় প্রত্যকটা দেশই এক ধরণের সংগ্রাম এবং বিপ্লবে মজে আছে যার সারমর্ম হ'ল এই যে তারা কোনোকিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করা ছাড়া।

এই মহাদেশের সমস্ত প্রায় সমস্ত দেশের মানুষের একটা ভাষা (ব্রাজিল বাদে, তবে যারা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে তারাও এই ভাষায় সড়গড় যেহেতু দুটো ভাষার মধ্যে অমোঘ মিল রয়েছে)। এই দেশগুলোর মধ্যে শ্রেনীগত মিল ও দেখা যায়, এবং এতে করে এরা একটা নির্দিষ্ট পরিচয়লাভ করেছে–আন্তর্জাতিক আমেরিকানো ধরনের, যা এই মহাদেশের চরিত্রকে অনেকটা বেশি সংজ্ঞায়িত করে অন্য মহাদেশের তুলনায়। ভাষা, স্বভাব, ধর্ম এবং একটা কমন বিদেশি মনিব–এইভাবে এই দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ। শাসকদের শোষণ করার মাত্রা ও ধরণও প্রায় এক এবং যাদের শোষণ করছে তারাও প্রায় একভাবে এই শোষণের শিকার হয়েছে আমাদের আমেরিকার বেশিরভাগ দেশজুড়ে। তারজন্য, বিদ্রোহ'ও এখানে দ্রুত প্রস্তুতি নেয়।

আমরা নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করতে পারি : কীভাবে এই বিদ্রোহ প্রসারিত হবে? কেমন ধরনের হবে এই বিদ্রোহের ধরণ? আমরা বেশ কিছুদিন থেকে ধরে রেখেছি যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের কারণেই আমাদের আমেরিকার এই সংগ্রাম সঠিক সময়ে মহাদেশীয় আকারে ছড়িয়ে পড়বে। মানবতার মুক্তির উদাহরণ হিসেবে এই লড়াই আরো অনেক লড়াইয়ের কাছে দৃশ্য হিসেবে থেকে যাবে।

মহাদেশীয় স্কেলে এই সংগ্রামের কাঠামোর মধ্যে এখন যে লড়াইগুলো দেশজুড়ে চলছে তা কেবল এক একটা পর্ব-তবে তারা ইতিমধ্যে তাদের শহীদদের সজ্জিত করেছে। আমাদের আমেরিকার ইতিহাসে এঁরা আগামী দিনে চিহ্নিত হবে যোদ্ধা হিসেবে যারা আমেরিকার মুক্তির খাতিরে রক্ত ঝরিয়েছে এবং শেষতক লড়ে গেছে, মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে। শহীদের মধ্যে অন্যতম নাম হিসেবে আমেরিকা মনে রাখবে কমানদান্তে তুর্কিওজ লিমা, পাদ্রে কামিলো তরেজ, কমানদান্তে ফাব্রিশিও ওহেদা, কমানদান্তে লোবাতন এবং কমানদান্তে লুই দ্য লা পুয়েন্তে উকেদা, এরা সকলেই উজ্জ্বল এবং অসামান্য লড়াকু নাম গুয়াতেমালা, কলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং পেরুর সংগ্রামী ইতিহাসে।

তবে, সক্রিয় আন্দোলন থেকে সৃষ্টি হয় নতুন নেতা; শিজার মন্তেজ এবং ইয়োঁ শোশা তাদের গুয়াতেমালার পতাকা উত্থান করতে সফল হয়েছে; ফাবিও ভাজকোয়েজ এবং মারুলান্দা, কলোম্বিয়ায়, পশ্চিমে ডগলাস ব্রাভো, এল বাখিলারে আমেরিকো মার্টিন, দুজনেই তাদের নিজেদের ভেনেজুয়েলা মোর্চাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নয়া বিদ্রোহের দিশা দেখা যাবে এই সমস্ত দেশ জুড়ে এবং আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলোতেও, যেমন বলিভিয়ায় সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বিপ্লবী হওয়ার এই

বিপজ্জনক পেশার অন্তর্ভুক্ত সমস্যাও বাড়বে। অনেকে নিজেদের ত্রুটির শিকার হয়ে নিঃশেষ হবে, অনেকে যুদ্ধের স্পর্শেই ব্যর্থ হবে; সংগ্রামের উষ্ণতায় নতুন যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত হবে, হবে নতুন নেতার উত্থান। যুদ্ধের নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী মানুষ তার পথের দিশারি'কে বেছে নেবে, তার যোদ্ধাদের বেছে নেবে–পাল্লা দিয়ে নিপিড়নের এজেন্ট হিসেবে ইয়্যাঙ্কিরাও বৃদ্ধি পাবে। আজ, যে সমস্ত দেশজুড়ে সশস্ত্র বিপ্লব চলছে, সেখানে সামরিক সহায়তা তৈরি হয়েছে, পেরুর সেনাবাহিনীরা সে দেশের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সফল পদক্ষেপ ও নিতে সক্ষম হয়েছে, এবং তা ইয়্যাঙ্কিদের নির্দেশে। কিন্তু যুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দু যদি রাজনৈতিক এবং সামরিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বৃদ্ধি পায় তাহলে বিরোধি পক্ষ অদম্য হয়ে উঠবে এবং ইয়্যাঙ্কিদের শক্তিবৃদ্ধি করতে বাধ্য করবে। পেরুতেই অনেক নতুন, অচেনা মুখ গেরিলা বাহিনী'কে পুর্নসংগঠিত করছে। যে অস্ত্রগুলো বিলুপ্তপ্রায়, কোনো ছোটো ব্যান্ডকে দমন করার কাজে লাগে, সেগুলোকে আধুনিক অস্ত্রের বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন সামরিক সহায়তাগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে আসল যোদ্ধাদের দিয়ে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না মার্কিন শাসন বাধ্য হচ্ছে বেশি সংখ্যায় নিয়মিত বাহিনী পাঠাতে, সরকারের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে। ক্রমে শাসকের হাতের পুতুল মার্কিন সেনা গেরিলাদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পড়ে ভাঙবে। এই পথেই ভিয়েতনাম মুক্তি লাভ করেছে, এই পথেই সমস্ত মানুষ মুক্তি লাভ করবে, এই পথই অনুসরণ করবে আমাদের আমেরিকা, এই সুবিধা নিয়ে যে আমাদের সশস্ত্র গোষ্ঠিগুলো কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল বা, সমন্বয় পরিষদ তৈরি করবে, ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ'কে পরাস্ত করার জন্য এবং সংগ্রামের বিজয়কে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য।

আমেরিকা, যেই মহাদেশ'কে শেষ মুক্তির সংগ্রাম মনে রাখেনি, সে আজ নিজের আওয়াজ ছড়িয়ে দিচ্ছে ত্রিমহাদেশ বা ট্রাইকন্টিনেন্টাল জুড়ে। একইসাথে, মানুষের অগ্রদূতের ডাক হিসেবে কিউবা বিপ্লব তার প্রাসঙ্গিকতা আরো পাকাপোক্ত ভাবে জানান দেবে: তৈরী হবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভিয়েতনাম, অথবা পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভিয়েতনাম।

আমাদের মনে রাখা জরুরি যে সাম্রাজ্যবাদ একটা বিশ্ব ব্যবস্থা, যা পুঁজিবাদের একদম শেষ স্টেজ-এবং বিশ্ব জুড়েই এই শাসন ব্যবস্থাকে পরাজিত হতে হবে। কৌশলগতভাবে এই সংগ্রারম শেষ করবে সাম্রাজ্যবাদ'কে। আমরা, যারা এই শাসন ব্যবস্থার দ্বারা শোষিত এবং অনুন্নত, আমাদের বাড়তি দায়িত্ব বর্তায় সাম্রাজ্যবাদের মূলকে উপড়ে ফেলা : আমাদের নিপীড়িত দেশ যেখান থেকে এরা লাভের গুড় কুড়োয় যেমন কাঁচামাল, প্রযুক্তিবিদ ও সস্তার শ্রম আহরণ করা এবং বদলে হাতে ধরিয়ে দেয় রপ্তানি করা নতুন পুঁজি-আধিপত্যের যন্ত্র-অস্ত্রশস্ত্র এবং আরো লোভনীয় টোপ; এভাবে আমাদের ঠেলে দেয় আরো নির্ভরতার দিকে।

এই কৌশলের মূল পদার্থকে দমন করতে পারলেই আমরা জয়ী হবো। মুক্তি পাবে মানুষ, এই মুক্তি আসবে সশস্ত্র বিপ্লবের হাত ধরে মূলত, এবং এই পথে হেঁটে

আমাদের আমেরিকা লাভ করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সাম্রাজ্যবাদ উপড়ে ফেলার স্বপ্ন দেখতে দেখতে এর মূল মাথাকেও আমাদের চিহ্নিত করতে হবে, অর্থাৎ USA.

শত্রুকে তার প্রাকৃতিক, আরামদায়ক পরিবেশ থেকে কৌশল করে সরিয়ে এনে ফেলতে হবে তার অচেনা ময়দানে, যেখানে সে অভ্যস্ত নয়, যেখানে সে তার চেনা ছকে আমাদের পরাস্ত করতে অক্ষম হবে। প্রতিপক্ষকে কখনোই বদ্ধমূল করা উচিত নয়; আমরা জানি US সরকারের হাতে পর্যাপ্ত প্রযুক্তি রয়েছে এবং তার সাথে রয়েছে অস্ত্র ও বিশালাকার সংস্থান ঢ়া তাকে ভয়ানক এবং শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু এই শক্তিশালী ক্ষমতাবান শত্রুর কাছে যা নেই তা হ'লো আদর্শ এবং তার অনুপ্রেরণা–যা আজ মার্কিন শক্তির প্রধান শত্রু–ভিয়েতনামি সেনার হাতিয়ার। ওদের নীতিকে পরাস্ত করে, মনোবল ক্ষুন্ন করে আমরা জয়ী হবো-এই হার এবং তার পুনরাবৃত্তি তাদের ভোগ করতেই হবে।

বিজয়ের এই সংক্ষিপ্ত রূপটি তৈরি হয় মানুষের অপরিসীম ত্যাগের ফলে, যেই আত্মত্যাগ আজ, এই দিনের আলোতেই, শুরু করা প্রয়োজন। দেখা যাবে হয়ত, এই আত্মত্যাগ মানুষকে যত না কষ্ট দেবে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি কষ্ট দেবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

এও সম্ভব হতে পারে যে বিশ্বের শেষ পৃথিবী যে এই মুক্তির সংগ্রামে নামবে সে জয়লাভ করবে সশস্ত্র বিপ্লব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লম্বা এবং পাষাণ লড়াই ছাড়ই। কিন্তু এই সংগ্রাম এবং এর প্রাপ্তি যা গোটা বিশ্বে ততদিনে ছড়াবে, তা এড়ানো অসম্ভব। আমরা ভবিষ্যদ্বানি করতে জানি না কিন্তু আমরা যেন কোনোমতেই সেই পরাস্ত হবার প্রলোভনে পা না বাড়াই যেখানে আমরা এমন এক দেশের অগ্রদূত হলাম যে মুক্তির কথা বলে এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে অথচ মুক্তিলাভের সংগ্রামে যেতে প্রস্তুত নয়।

নিরর্থক ত্যাগের জায়গাগুলো এড়িয়ে যাওয়া অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং, নির্ভরশীল আমেরিকাকে বাস্তবিক ভাবেই যে যে উপায়ে প্রশান্তিতে মুক্ত করা সম্ভব সেগুলো তাকে চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের কাছে, এর উপায় খুব স্পষ্টভাবে রয়েছে–বর্তমান পরিস্থিতি সংগ্রামের জন্য সঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তা ব'লে আমরা কোনো বিভ্রান্তির আশ্রয় নিতে পারি না; আমাদের সে অধিকার নেই এই ভ্রান্তিতে গা ভাসানো যে স্বাধীনতা কোনো লড়াই ছাড়াই আদায় করা সভব। এই লড়াই রাস্তায় দাঁড়িয়ে টিয়ারগ্যাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাথর ছোঁড়া না, অথবা শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট। আবার একদল ক্ষিপ্ত মানুষের দু'তিনদিন ধরে শাসকগোষ্ঠীর ভারা ধ্বংস করাও নয়। এই লড়াই দীর্ঘ, কঠিন, এবং গেরিলা আশ্রয়ের দ্বারা পরিচালিত হবে বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন যোদ্ধার ঘরে ঘরে-যেখানে শত্রু পক্ষ দমন করার জন্য সহজেই বেছে নেবে যোদ্ধাদের প্রিয়জন, ঘরবাড়িকে-ধ্বংস করে দেবে গ্রামগঞ্জ, শহর, বোমায় উড়িয়ে দেবে শত্রুদের।

ওরা আমাদের এই সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; এর কোনো বিকল্প নেই : আমাদের এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার প্রস্তুতি নিতেই হবে এবং লড়তেই হবে।

লড়াইয়ের শুরুটা সহজ হবে না; অত্যন্ত রূঢ় ও কঠিন হবে। সমস্ত অভিজাতদের দমন করার ক্ষমতা, তাদের চরম পাশবিকতা এবং জনগণকে বিমুখ করার সমস্ত হাতিয়ার ও কৌশল তারা কাজে লাগাবে তাদের একরোখা দাবি আদায়ের জন্য। প্রথম ঘন্টায় আমাদের কাজ হবে সেই হাতিয়ার থেকে নিজেদের সুরক্ষা করা। তারপর, আমরা গেরিলার চিরন্তন প্রথা অবলম্বন করবো যেখানে আমাদের সশস্ত্র প্রচারে নামতে হবে (ভিয়েতনামিজ অর্থে, যুদ্ধের বুলেটস অব প্রোপাগান্ডা, হারি বা জিতি–লড়াই করে যাবো–শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে)। গেরিলা যুদ্ধের অদম্য সাহস এবং কৌশল পাঠ নিষ্পত্তিহীন জনসাধারণ রপ্ত করবে। জাতীয় চেতনাকে উত্সাহিত করা, আরো কঠিন কাজের প্রস্তুতি নেওয়া, বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে আসা আরো ভয়ানক দমন রুখে দেওয়া-এগুলো হবে যুদ্ধের অংশ। চরম ঘৃণা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, শত্রুর প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমাদের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার ওপর আঘাত আনবে, প্ররোচিত করবে আমাদের সেই সীমা পেরোতে এবং রূপান্তরিত করবে এক কার্যকর, হিংগ্র, নির্বাচনী এবং ঠান্ডা রক্তের মেশিনে। আমাদের সেনা হবে এরমই : কেননা ঘৃণা ছাড়া কোনো মানুষ তার চূড়ান্ত পাশবিক শত্রুকে দমন করতে সক্ষম হয় না।

এই লড়াই আমাদের দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিতে হবে, যেখানে আমাদের শত্রুরাও ছড়িয়ে রয়েছে : তার ঘরে, তার বিলাসিতার আখড়ায় লাগাতে হবে যুদ্ধ। শত্রুকে একচুল জমিও ছাড়া যাবে না তার শান্তির জন্য, তার ব্যারাকের শান্ত পরিবেশ অনুভব করার জন্য, তার ঘরের ভেতরও তাকে ছাড়া যাবে না। যেখানেই শত্রুকে দেখবে সেখানেই তাকে নিঃশেষ করতে হবে। তাকে জমি জায়গাহীন এক নিতান্ত পশুর মত অনুভব করাতে হবে তাহলেই তার নৈতিক দৃঢ়তা হ্রাস পেতে শুরু করবে। সে হয়তো আরো ভয়ানক একটা জানোয়ারে পরিণত হবে, কিন্তু তার এই পরিবর্তনটাও লক্ষ্য করতে হবে-কীভাবে তার ক্ষয় হচ্ছে।

আসো, আমরা এক সত্য সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ ঘটাই, আন্তর্জাতিক সর্বহারা সেনাবাহিনীকে পাশে রেখে। যে পতাকার তলায় আমরা লড়ব তার মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখবো যে এই লড়াই মানবতার মুক্তির স্বার্থে। লড়াই করেই মরবো ভিয়েতনাম, ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা, লাওস, গিনি, কলাম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল যে পতাকার তলায় লড়েছে-কয়েকটা সশস্ত্র সংগ্রামের চেহারা মাত্র। এই লড়াইয়ের চেহারাই কাম্য হবে একজন আমেরিকান, একজন এশিয়ান এমনকি একজন ইয়োরোপিয়ানের কাছে।

যে তার রক্তের এক একটি বিন্দু ঝরিয়েছে এমন এক দেশে যে দেশের পতাকার নীচে তার জন্ম হয়নি, সে তার দেশে এই সংগ্রামের মানে বহন করে নিয়ে যাবে এবং সেখানে মুক্তির লড়াইয়ের দিশা দেখাবে। যেই দেশ মুক্তিলাভ করছে, সে

তার লড়াইয়ের ফলে স্বাধীনতার দিকে এক ধাপ পা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এটাই মোক্ষম সময় আমাদের সমস্ত বিভেদকে দূরে ঠেলে রেখে সংগ্রামের কাছে নিজেদের সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দেওয়ার।

আমরা জানি যে বিশ্বে স্বাধীনতার লড়াই নিয়ে বিতর্ক চলছে; কেউ এটাকে গোপন করতে পারবে না। আমরা এও জানি যে এই মতপার্থক্য এখন এত তিক্ততার আকার নিয়েছে যে এ বিষয়ে সংলাপ–আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট কিংবা একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুব শক্ত, তবে অসম্ভব নয়। এত প্রতিকূলতার জন্য খোলামেলা আলোচনার উপায় নিয়ে ভাবা অর্থহীন, তাই এই প্রয়োজনীয় সংলাপে কোনো পার্টি যায় না। অথচ, প্রধান শত্রু ঠিকই তার জায়গায় অবস্থিত। সে প্রতিদিন আমাদের আঘাত করে, হুমকি দেয়.হ্রাস করার প্রতিনিয়ত। এই আঘাত খেতে খেতে আমরা আজ, নয় কাল, নয় পরশু ঠিক বুঝবো আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়া কতটা জরুরি। যে আগে বুঝবে এবং এই একতার প্রস্তুতি নেবে, সেই মানুষের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবে।

লক্ষে পৌঁছনোর জন্য যে তীব্রতা ও লড়াইয়ের মূল কারণের দিকে অন্তর্মুখী হতে হচ্ছে আমাদের, আমরা, নিস্পত্তিহীনরা, এরপর কোনোরকম অনৈক্যর দিকে পা বাড়াবো না, যদিও মাঝেমধ্যেই আমদের এই প্রসঙ্গে বিতর্কে যেতে হয়। যুদ্ধ চলাকালীন, এই দ্বিমত ও বিতর্ক দুর্বলতার লক্ষণ এবং এই মুহূর্তে এই অনৈক্য বাক্য বিনিময়ে নির্মান করার ভ্রান্তিও ভুল। ইতিহাস হয় এগুলো সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে নয় এর সঠিক মানে তৈরি করে দিয়ে যাবে।

আমাদের লড়াইয়ের বাস্তবে, যেকোনো কৌশলের পথ সম্পর্কিত তাতপর্যকে, সীমিত উদ্দেশ্যে অর্জনের ক্রিয়া পদ্ধতিকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে অন্য যোদ্ধার মতামতকে সম্মান দিয়ে বিচার করতে হবে। বড়ো লক্ষ্য, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার পথে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কোনো পথ নেই, এই বিষয়ে আমরা যেন আপোষহীন ভাবে এক হই।

আসুন, আমরা আমাদের সমস্ত আশা ভরসা একত্রিত করি জয়ের পক্ষে। জয় হবে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বাঁধের ভীত নারিয়ে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে অর্থাৎ USA'র অত্যাচারকে খর্ব করে। এটা সফল করার জন্য কৌশলে এক এক করে অথবা দলসহ শত্রুকে তার পরিচিত এলাকার বাইরে নিয়ে আসতে হবে। এভাবেই তার সুরক্ষা ও রক্ষণা বেক্ষণের চেনা দৃশ্য থেকে বের করে দুর্বল করে দিতে হবে।

এর মানে একটা দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। এবং আবারো মনে করাই, একটা অমানবিক যুদ্ধ। নিজেদের অন্যথা ভেবে এবং ভুলিয়ে রাখার অর্থ নেই। যা হবার তা হবেই। এটুকুই আমাদের জয়ের সম্বল। এই মোক্ষম সময়কে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। ভিয়েতনাম তার অসংখ্য সাহসিকতার পরিচয়ের দ্বারা আমাদের পথ

দেখিয়েছে। আমাদের দেখিয়েছে এই লড়াইয়ের করুণ দৃশ্য, যুদ্ধের নিয়মিত টানাপোড়েন এবং অন্তিম বিজয়ের জন্য মৃত্যু।

ওখানে, সাম্রাজ্যবাদ সেনাদের অস্বস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে, যারা আগে US'র বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিলো। তাদের এখন প্রতিকূলতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে, শত্রুপক্ষের জমিতে, কোনোরকম সুরক্ষা ছাড়াই। যেখানে আটক করা হয়েছে সেখান থেকে এক ইঞ্চি নড়লেই পাকাপাকি ভাবে সবাই নির্মুল হবে। সেনাদের প্রতি এই আচরণ US'র অভ্যন্তরীণে আঘাত হানছিলো; সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হ্রাস পাচ্ছে তাদের শক্তির উপাদান থাকা সত্ত্বেও : তৈরি হচ্ছে নিজেদের এলাকায় শ্রেণি সংগ্রাম।

পৃথিবীর বুকে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠন হবে যদি আরো দু'তিনটে ভিয়েতনাম তাদের মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যায়। অশেষ করুণা, প্রত্যেকদিনের লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদের মুখে ক্রমাগত আচমকা আঘাত বিশ্বজুড়ে এই সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসনের বিরুদ্ধ মানুষের মনে বিদ্বেষ তৈরি করেছে এবং এই সাম্রাজ্যবাদ বাহিনীর ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য করেছে!

আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই আমাদের আঘাতের জোর আরো প্রবল হবে এবং এই যুদ্ধে আমরা আরো সমর্থন লাভ করবো চারিদিক থেকে -এতে বিপ্লব আরো কাছে ঘনিয়ে আসবে!

আমরা যদি বিশ্ব মানচিত্রের ক্ষুদ্রতম অংশে দাঁড়িয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারি, নিজেদের সর্বস্বটুকু এই লড়াইয়ে সমর্পণ করে : আমাদের জীবন, আমাদের আত্মত্যাগ, যদি আমাদের কখনো কোথাও শেষ নিশ্বাস নিতে হয় কোনো জমিতে দাঁড়িয়ে, যে জমি ততদিনে আমার হয়ে গেছে, আমার রক্ত, ঘাম দিয়ে যে জমি আমি আদায় করেছি, জানবো যে আমাদের সমস্ত কাজ একটাই স্বার্থে, আমরা সকলেই সর্বহারার সৈন্য কিন্তু আমরা কিউবা বিপ্লব এবং তার সর্বোচ্চ নেতার মনোভাব থেকে শিখেছি :'সমগ্র মানবতা যখন ঝুঁকির মুখে তখন একটা মানুষ, একটা দেশের আত্মত্যাগ বা বিপদে কি কিচ্ছু যায় আসে?'

আমাদের প্রতিটা ক্রিয়াই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের রব, এবং একটি যুদ্ধের স্তব শত্রুপক্ষ অর্থাৎ USA'র বিরুদ্ধে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের। মৃত্যু যতই অবাক করুক, তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই, এই কথাটা মাথায় রেখে যে আমাদের যুদ্ধের কান্না হয়তো দূরে কারোর কানে পৌঁছবে অথবা আরেকটা হাত আমরা বাড়িয়ে দেব আমাদের অস্ত্র তৈরির কাজে, অন্য কোথাও অন্য কেউ অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত, তার স্টাকাটো থেকে ছড়িয়ে পড়বে মেশিন গানের সুর এবং মতুন যুদ্ধ ও বিজয়ের সূচনা।

★

কিউবায় সমাজতন্ত্র এবং মানুষ[১]

[এই চিঠি কার্লোস কুইহানোকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ছিলেন উরুগুয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মার্চা'র সম্পাদক। ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ এটি প্রকাশিত হয়।]

প্রিয় কমরেড[২],

আফ্রিকাতে আমার ভ্রমণের মাঝে মাঝে এই নোটগুলো শেষ করছি। দেরি করে হলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাসনাই আমার চালিকাশক্তি। সেটা করার জন্য আমি শিরোনামে উত্থাপিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার মনে হয় উরুগুয়ের পাঠকরা এই বিষয়ে আগ্রহী হবেন।

পুঁজিবাদের মুখপাত্ররা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে বলেন যে সমাজতন্ত্র, অথবা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার যে স্তরে আমরা প্রবেশ করেছি, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের স্বার্থে

---

[১] এই গ্রন্থে এর্নেস্তো 'চে' গ্যেভারার যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে যার বিশ্লেষণ বিশেষ প্রেক্ষিতের মধ্যে করতে হবে। এই কারণে আমাদের সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত এই যে আমরা শিরোনাম পরিবর্তন করবো না এবং তার মধ্যে দিয়ে মূল বিষয়বস্তুকে সংরক্ষণ করব। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এ কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার যে এই লেখাগুলি পুনঃপাঠ এবং পুনঃপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা চে'র সঙ্গে আলাপচারিতার এবং তাঁর আদর্শকে তুলে ধরার বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছি। বিশেষ করে 'নতুন মানুষ' এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের ভূমিকার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। আজকে, যখন আমরা বিভিন্ন রকমের নারীবাদী সংগঠন করার ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন এই লেখাগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক স্থানাঙ্ক যা আমাদের লড়াকু কল্পনাকে আহ্বান জানায় এই ধারণা, তার গুরুত্ব, তার রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য। ১৯৬৩ সালে আরিগুয়ানাবো টেক্সটাইল কারখানার সাধারণ সভাতে চে নিজেই যেমন বলেছিলেন, "অতীত এখনো আমাদের ওপর ভর করে আছে; নারীমুক্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। আমাদের পার্টির একটি কাজ হওয়া উচিত তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করা [...]; এটিও অতীতদের একটি প্রথার ভার।" চে'র লেখা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব একধরণের সক্রিয় অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই কাঠামোর মধ্যে, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এই লেখাগুলিকে যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে। এবং দেখতে হবে মানুষের "যা বদলাতে হবে তা বদলের" স্বাধীনতা পাওয়ার সংগ্রামের সহায়ক হিসেবে।

[২] এই চিঠি কার্লোস কুইহানোকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ছিলেন উরুগুয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মার্চা'র সম্পাদক। ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ এটি প্রকাশিত হয়।

ব্যক্তির স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। আমি শুধু তাত্ত্বিক ভাবে এই যুক্তি খণ্ডন করব না। বরং কিউবার বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করব এবং সাধারণ কিছু মন্তব্য করব। ক্ষমতা দখলের আগে এবং পরে আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসের কথা দিয়ে শুরু করা যাক।

এ কথা সবাই জানে যে ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল যার চূড়ান্ত পরিণতি হল ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে। সেই দিন ভোরবেলা ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে একটি দল ওরিয়েন্তে অঞ্চলের মনকাডা সেনাছাউনি আক্রমণ করে। আক্রমণটি ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতা পরিণত হয় বিপর্যয়ে। যারা বেঁচে ছিল তাদের জেলে পুরে দেওয়া হয়। একটি ক্ষমাপত্রের কারণে মুক্তি পাওয়ার পর তারা আবার বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করে।

এই প্রক্রিয়াতে সমাজতন্ত্রের বীজই ছিল শুধু। এবং মানুষ ছিল এর এক মৌলিক উপাদান। আমরা তার ওপর ভরসা করেছিলাম-ব্যক্তি, বিশেষ, নাম-পদবি সম্পন্ন-এবং তার কাঁধে যে অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করছিল সেই ব্যক্তির কর্মক্ষমতার ওপর।

তারপর এলো গেরিলা যুদ্ধের পর্ব। দুটি বিশেষ পরিবেশে এর বিকাশ ঘটে: জনগণ-যে নিদ্রিত দলকে সংহত করতে হত; এবং তার ভ্যানগার্ড-গেরিলারা-সংহতির চালিকাশক্তি, বিপ্লবী চেতনা এবং সংগ্রামী উদ্দীপনার উৎপাদক। জয়ের জন্য যে বিষয়ীগত পরিস্থিতি প্রয়োজন, তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল এই ভ্যানগার্ড। এ ক্ষেত্রেও, আমাদের ভাবনার প্রোলেটারিয়ানাইজেশানের কাঠামোতে, আমাদের অভ্যেস এবং আমাদের মনে যে বিপ্লব ঘটলো তার কাঠামোতে, ব্যক্তি মানুষই ছিল প্রধান উপাদান। সিয়েরা মায়েস্ত্রার যে সকল যোদ্ধা বিপ্লবী বাহিনীর উচ্চ পদে আসীন হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসাধারণ কিছু কীর্তি যার ভিত্তিতে তারা তাদের পদ লাভ করেছে।

বীরত্বগাথার প্রথম পর্ব

এই সেই বীরত্বের পর্ব যেখানে যোদ্ধারা এমন ভূমিকা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছিল যাতে বেশি দায়িত্ব আছে, আছে বেশি বিপদের ভয়, এবং নিজের কর্তব্য পালনের আনন্দ ছাড়া আর কোনও তৃপ্তি নেই। বিপ্লবী শিক্ষা প্রদানের কাজ করতে গিয়ে আমরা মাঝেমাঝেই এই শিক্ষণীয় বিষয়ের কাছে ফিরে যাই। আমাদের যোদ্ধাদের মনোভাবের মধ্যে দেখা যায় ভবিষ্যৎ-এর মানুষের ঝলক।

আমাদের ইতিহাসের অন্য কিছু মুহূর্তেও বিপ্লবের প্রতি সম্পূর্ণ উৎসর্জনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অক্টোবর সংকট এবং হারিকেন ফ্লোরার সময় আমরা সমগ্র জাতির বীরত্ব এবং ত্যাগের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। আদর্শগত দিক থেকে এই বীরের মনোভাব প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে চালিত করাই আমাদের মূল কাজগুলির মধ্যে একটি।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্বাসঘাতক বুর্জোয়াদের বিভিন্ন সদস্যদের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল বিপ্লবী সরকার। রেবেল আর্মির উপস্থিতি ছিল ক্ষমতার গ্যারান্টির মৌলিক উপাদান।

প্রথম থেকেই কিছু গুরুতর দ্বন্দ্ব দেখা দিল। প্রথম ক্ষেত্রে, ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফিদেল কাস্ত্রো যখন প্রধান মন্ত্রী হিসেবে সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তখন এই দ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটল। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্বে সেই বছরের জুলাই মাসে জনগণের চাপে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

কিউবার বিপ্লবের ইতিহাসে এবার প্রবেশ ঘটল এক নতুন চরিত্রের। তার বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ স্পষ্ট। এবং পরবর্তীকালেও সে ফিরে ফিরে এসেছে। সেই চরিত্রটি হল-জনগণ। বলা হয়ে থাকে যে এই বহুমুখী সত্বাটি একই ধরণের অনেক উপকরণের যোগফল (উপর্যুপরি শাসন ব্যবস্থার ফলে এই একই ধাঁচায় তাকে নামিয়ে আনা হয়েছে) এবং মেষপালের মত তার আচরণ। আদপে কিন্তু তা নয়। এ কথা সত্যি যে সে তার নেতাদের নিঃসংশয়ে অনুসরণ করে, বিশেষ করে ফিদেল কাস্ত্রোকে। কিন্তু মানুষের আশা-আকাংক্ষাকে সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছেন বলে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর বলেই মানুষ তাঁকে এতটা ভরসা করে।

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

সাধারণ মানুষ কৃষি সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিচালনার কঠিন কাজে অংশগ্রহণ করল। 'প্লায়া গিরোন'-এর [শূকর উপসাগর] বীরত্বের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। সি আই এ'র আনুকূল্যে অস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন দস্যুদলের বিরুদ্ধে লড়াই করে করে শক্ত হল তারা। আধুনিক যুগের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মধ্যে একটি ছিল অক্টোবর সংকট। সেই সংকটের মধ্যে দিয়ে বাঁচার অভিজ্ঞতাও হল তাদের। এবং এখনো তারা সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ করে চলেছে।

আপাত ভাবে দেখলে মনে হবে যে যারা মনে করে রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তি অবদমিত হয়, তারা ঠিক কথাই বলছে। সরকারের নির্দেশানুসারে মানুষ তুলনারহিত উৎসাহের সঙ্গে শৃঙ্খলা মেনে কাজ করে। সে অর্থনীতি, শিল্প, প্রতিরক্ষা, খেলাধুলো-যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। উদ্যোগ সাধারণত আসে ফিদেলের থেকে অথবা বিপ্লবী নেতৃত্বের থেকে এবং মানুষকে বুঝিয়ে বলা হয়, এবং তারা সেটাকে আত্মস্থ করে। অনেক সময় একই পদ্ধতিতে পার্টি এবং সরকার একটি স্থানীয় ঘটনা নিয়ে বলতে বলতে সাধারণে পৌঁছে যায়।

তা সত্বেও, রাষ্ট্র মাঝে মাঝে ভুল করে। যখন এরকম কোনও ভুল হয়, তখন সামগ্রিক উদ্দীপনায় খানিকটা ভাঁটা পড়ে বলে লক্ষ্য করা যায়। জনসাধারণ যে উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত, সেই প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াই এর কারণ। গুরুত্বহীন একটি ধাপ অব্দি না পৌঁছনো পর্যন্ত কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে যা ঘটেছিল তার কারণ ছিল আনিবাল এস্কালান্তে পার্টির

ওপর চাপিয়ে দেওয়া উপদলীয় নীতি।

একের পর এক যুক্তিসঙ্গত নীতিরই প্রচলন সুনিশ্চিত করার জন্য স্পষ্টতই এই পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজনের মানুষের সাথে আরও নির্দিষ্ট সম্পর্ক, যেটা আগামী বছরগুলোতে আমাদের আরও উন্নত করতে হবে। তবে সরকারের উচ্চ স্তরের উদ্যোগের কথা যদি বলি, তাহলে আমরা প্রায় স্বজ্ঞাত একটা পদ্ধতি ব্যবহার করছি যার মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছি।

এই কাজে ফিদেল অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি যে ভাবে মানুষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারেন তা না দেখলে ঠিক ভাবে কদর করা যায় না। বিপুল জনসভাতে মনে হয় যেন দুটো টিউনিং ফর্কের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নতুন ধ্বনি তৈরি হচ্ছে। কথোপকথনের তীব্রতা যত বাড়তে থাকে, ফিদেল এবং জনসাধারণ যেন একসাথে কেঁপে কেঁপে ওঠে যতক্ষণ না চরম মুহূর্তে আমাদের সংগ্রাম এবং জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে সেটা হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায়।

বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে যাচ্ছে না তার পক্ষে ব্যক্তি ও জনগণের এই নিকট দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বুঝে ওঠা সম্ভব নয়, যে সম্পর্কে দুজনের আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, এবং একই সঙ্গে যেখানে জনগণ, ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে, তার নেতাদের সঙ্গে ইন্টার‍্যাক্ট করে।

পুঁজিবাদের অদৃশ্য নীতি

এই ধরণের কিছু ঘটনা পুঁজিবাদই ব্যবস্থাতেও দেখা যায় যখন রাজনীতিবিদ্রা জনগণের ভাবনা-চিন্তাকে পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু যখন এগুলো সত্যিকারের সামাজিক আন্দোলন হয় না-যদি হত তাহলে সেগুলিকে পুঁজিবাদী বলা পুরোটা ঠিক হত না-তখন এদের অনুপ্রেরণাদায়ী নেতার মেয়াদ যতদিন, এদের মেয়াদও হয় ততদিনের, অথবা ততক্ষণ যতক্ষণ না নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী সমাজ মানুষের বিভ্রমকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ এমন এক আইনের বশে থাকে যে আইনকে সে বুঝতেই পারে না। বিচ্ছিন্ন মানুষ সমাজের সঙ্গে জুড়ে থাকে যে নাড়ির টানে সেটি হল মূল্যের আইন। এই আইন জীবনের সব ক্ষেত্রে কাজ করে এবং তার পথ এবং ভবিতব্য নির্ধারণ করে দেয়।

পুঁজিবাদী আইন সাধারণ মানুষকে দেখতে পায় না, নিজেও দেখা দেয় না। তার ক্রিয়া সাধারণ মানুষ খেয়াল করে না। চোখে পড়ে শুধু আপাত অসীম সীমান্ত রেখা। পুঁজিবাদী প্রোপাগান্ডা এইরকম ভাবেই সেই ছবি আঁকে। এই প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য রকেফেলারের উদাহরণ ব্যবহার করে ব্যক্তির সম্ভাব্য সাফল্যের শিক্ষা দেওয়া, তা সে সত্যি হোক আর না-ই হোক। একজন রকেফেলারের আবির্ভাবের পিছনে যে ভয়াবহ দারিদ্র এবং দুর্দ্দশা রয়েছে এবং এই মাত্রায় ধন দৌলত আহরণের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ দুরাচার রয়েছে তা ছবি থেকে বাদ দিয়ে

দেওয়া হয়। এবং জনসাধারণের শক্তি সব সময় এটাকে স্পষ্ট ভাবে দেখাতে পারে না। (সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে কী ভাবে শ্রমিকরা নির্ভরশীল দেশগুলির শোষণের প্রক্রিয়ায় কিছু মাত্রায় সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছে তা নিয়ে একটা আলোচনা এখানে মানানসই হত, কিন্তু এই নোটের বিষয়বস্তুতে তার স্থান নেই)।

যাই হোক, সাফল্যের পথকে কন্টকাকীর্ণ হিসেবেই দেখানো হয়-এমন সব কাঁটা যা সঠিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি তুলে ফেলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। দূরে পুরস্কার দেখা যায়। পথ একাই চলতে হয়। উপর্যুপরি, এটা হল নেকড়েদের প্রতিযোগিতা। অন্যের হারেই আপনার জিত।

ব্যক্তি ও সমাজতন্ত্র

এখন আমি ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করব। সমাজতন্ত্র নির্মাণের অদ্ভুত এবং মর্মস্পর্শী নাটকের অভিনেতা, একই সাথে সে অনন্য এবং সমাজের সদস্য। আমার মনে হয় এর মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির অসম্পূর্ণতা সবথেকে ভালো বোঝা যায়। বোঝা যায় সে এখনো পুরোটা তৈরি হয়নি।

নিজের চেতনার মধ্যে দিয়ে অতীতের অবশেষ বর্তমান অব্দি চলে আসে। তাকে মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন অবিরাম শ্রম। এই প্রক্রিয়াটির দুটি দিক আছে। এক দিকে সমাজ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে কাজ করে; অন্যদিকে ব্যক্তি স্ব-শিক্ষার প্রক্রিয়ায় সচেতন ভাবে নিযুক্ত হয়। নতুন নির্মীয়মাণ সমাজকে অতীতের সঙ্গে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়। নিজের চেতনায়ড়যেখানে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার শিক্ষার অবশিষ্টাংশ থেকে গেছেড়সেখানেই শুধু নয়, অতীত এই রূপান্তরের পর্বেও নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়, যে পর্বে পণ্য সম্পর্ক অব্যাহত আছে। পণ্য হল পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কোষ। যতদিন সে থাকবে ততদিন উৎপাদন এবং ফলস্বরূপ চেতনায় তার ছাপ পড়বেই।

রূপান্তরের এই পর্ব সম্পর্কে মার্ক্স বলেছিলেন যে পুঁজিবাদী সমাজ যখন নিজের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নিঃশেষিত হয়ে বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে আমূল বদলে যায়, তখন এই পর্বের সূচনা ঘটে। কিন্তু অতীতের বাস্তবতা আমাদের শিখিয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের মহীরুহে যেসমস্ত দেশ দুর্বল ডালপালা ছিল, সেগুলোকে আগে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। লেনিন এটা আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। এই দেশগুলোতে পুঁজিবাদের বিকাশ এমনই হয়েছিল যে কোনও না কোনও ভাবে মানুষ তার পরিণাম বুঝতে পারছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিজেকে নিঃশেষিত করার ফলে বিস্ফোরণ ঘটেনি। বিদেশী শাসকের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম, যুদ্ধের মত বাহ্যিক ঘটনার ফলে সৃষ্ট দুর্দশা যার ফলে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ শোষিতের ঘাড়ে এসে পড়েছিল, নয়া-ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার থেকে মুক্তি আন্দোলন-এগুলোই এই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটার কারণ। সচেতন ক্রিয়া বাকি কাজটা করে।

এই দেশগুলিতে এখনও সামাজিক শ্রমের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পদ এখনো মানুষের হাতে আসতে অনেক দেরি আছে। একদিকে উন্নয়নের অভাব। অন্যদিকে বেশি 'সভ্য' দেশে পুঁজির পাড়ি দেওয়া। এই দুয়ের ফলে আত্মত্যাগ ব্যতিত দ্রুত রূপান্তর অসম্ভব। অর্থনীতির ভিত স্থাপনের জন্য এখনো অনেক পথ হাঁটা বাকি এবং বস্তুগত আকাঙ্ক্ষাকে চাগাড় হিসেবে ব্যবহার করে বহুল ব্যবহৃত পথে হাঁটার যথেষ্ট প্রলোভন রয়েছে।

গাছের মধ্যে দিয়ে জঙ্গল দেখতে না পাওয়ার বিপদ রয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে পুঁজিবাদের ফেলে যাওয়া ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করা (অর্থনৈতিক কোষ হিসেবে পণ্যকে ব্যবহার, মুনাফা, বস্তুগত আকাঙ্ক্ষাকে চাগাড় হিসেবে ব্যবহার) কাণাগলিতে গিয়ে শেষ হতে পারে। এবং অনেক দূর হেঁটে এসে, অনেক মোড় পেরিয়ে এই কাণাগলিতে একবার প্রবেশ করলে বোঝা মুশকিল যে ঠিক কোথায় ভুল রাস্তাটা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে যে অর্থনৈতিক ভিত স্থাপন করা হয়েছে সে চেতনার উন্মেষকে খাটো করে দেখিয়ে ফেলেছে। কমিউনিজ্‌ম তৈরি করতে গেলে এবং একই সঙ্গে নতুন বস্তুগত ভিত স্থাপন করতে গেলে, নতুন মানুষ গড়া প্রয়োজন।

নবচেতনা

এই জন্য জনগণকে চালিত করার সঠিক অস্ত্র বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই অস্ত্রের চরিত্র হতে হবে ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু বিশেষত সামাজিক চরিত্রবিশিষ্ট বস্তুগত প্রণোদকের সঠিক ব্যবহারকে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না।

আমি আগেই বলেছি, ঘোর বিপদের সময় তাদের কার্যকারিতা বজায় রাক্ষার জন্য নৈতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করা সহজ। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন এমন এক চেতনার উন্মেষ যেখানে মূল্যের নতুন মাত্রা রয়েছে। গোটা সমাজকে একটা বিশাল স্কুলে পরিণত করতে হবে।

এই ঘটনার ছক মোটামুটি ভাবে পুঁজিবাদী চেতনার প্রথম উন্মেষের প্রক্রিয়ার মতো। পুঁজিবাদ ক্ষমতা ব্যবহার করে, কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে থাকা মানুষকে শিক্ষাও দেয়। প্রত্যক্ষ প্রচারের কাজে যুক্ত হন তাঁরা, যাঁদের কাজ হল এটা বোঝানো যে শ্রেণি বিভক্ত সমাজ হল অবশ্যম্ভাবী। এই কাজ তাঁরা করে থাকেন হয় দৈব উদ্ভবের কোনও তত্ত্বের সাহায্যে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও যান্ত্রিক তত্ত্বের দ্বারা। এটি ঘুমপাড়ানি হিসেবে কাজ করে কারণ মানুষ দেখে যে, যে ভয়ানক শক্তি তাকে দমন করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অসম্ভব।

এর পরে আসে আশা। এই ক্ষেত্রে পুঁজিবার আগেকার কাস্ট ব্যবস্থার থেকে আলাদা যেগুলি থেকে বেরোনর কোনও উপায় ছিল না। কারুর কারুর ক্ষেত্রে কাস্ট ব্যবস্থার মূল মন্ত্র কার্যকরী থেকেই যাবে। যে বাধ্য তার পুরস্কার হল মৃত্যুর পর অপূর্ব এক জগতে স্থান পাওয়া যেখানে, পুরনো বিশ্বাস অনুযায়ী, ভালো মানুষরা

পুরস্কৃত হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে একটা উদ্ভাবন রয়েছে-শ্রেণি বিভাজন ভাগ্যের দ্বারা নির্ধারিত, কিন্তু মানুষ তার শ্রম এবং উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে নিজের শ্রেণি থেকে উন্নীত হতে পারে। এই প্রক্রিয়া এবং স্বনির্মিত ব্যক্তির এই মিথ অত্যন্ত কুটিল। এটা স্বার্থপরতার প্রদর্শন যে মিথ্যেই হল সত্যি।

আমাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শিক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য কারণ এটা সত্যি। এর মধ্যে কোনও ছল-চাতুরি নেই। সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সাধারণ, প্রায়োগিক এবং আদর্শগত শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং এই কাজ করে শিক্ষা মন্ত্রক এবং পার্টির প্রচার। শিক্ষা মানুষের মধ্যে গেঁথে যায় এবং নতুন যা মনোভাবের কথা ভাবা হয়েছে তা অভ্যেসে পরিণত হয়। মানুষ শিক্ষাকে নিজের মত করে আত্মস্থ করে এবং যারা এখনো শিক্ষা পায়নি তাদের অনুপ্রাণিত করে। মানুষকে শিক্ষিত করার এই পরোক্ষ পদ্ধতিও সমান ভাবে শক্তিশালী।

স্বশিক্ষার সচেতন প্রক্রিয়া

কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি সচেতন। জনগণ সর্বদাই নতুন সামাজিক শক্তির প্রভাব অনুভব করে এবং দেখে যে তারা সেই মানে পৌঁছতে পারেনি। পরোক্ষ শিক্ষার চাপে তারা যে অবস্থাটাকে ঠিক মনে করে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাদের নিজেদের বিকাশের অভাব তাদের আগে এখানে পৌঁছতে দেয়নি। তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করে তোলে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই পর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি কী ভাবে নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে। গোটা ছবিটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি-কখনো হবেও না। কারণ এই প্রক্রিয়া নতুন নতুন অর্থনৈতিক গঠনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলে। যাদের শিক্ষার অভাব তাদের স্বার্থসিদ্ধির একলা পথে নিয়ে গেছে তাদেরকে বাদ দিলেও এই মিলিত অগ্রগতির প্যানোরামাতে আরও এক দল মানুষ আছে যারা তাদের সঙ্গে হেঁটে চলা মানুষের থেকে কিছুটা দূরে দূরে থাকে। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যে প্রত্যেক দিন মানুষ সমাজে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং একই সঙ্গে সেই সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে নিজেদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে।

আর তারা সম্পূর্ণ একা একা দূরবর্তী আকাঙ্ক্ষার হারিয়ে যাওয়া পথে হাঁটে না। তারা নিজেদের ভ্যানগার্ডদের অনুসরণ করে যার মধ্যে রয়েছে পার্টি, অগ্রসর কর্মী, উন্নত মানুষ যারা সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলছে। ভ্যানগার্ডের সৃষ্টি ভবিষ্যত এবং তার পুরস্কারে স্থির। কিন্তু এটা ব্যক্তির পুরস্কার পাওয়া নয়। পুরস্কার হল নতুন সমাজ যেখানে মানুষের আলাদা আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকবে-কমিউনিস্ট মানুষের সমাজ।

পথ দীর্ঘ এবং কঠিন। কখনো কখনো আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলে পিছনে ফিরে যেতে বাধ্য হই। আবার কখনো আমরা বড় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মানুষের সান্নিধ্য

হারিয়ে ফেলি। অনেক সময় আমাদের গতি খুব শ্লথ হয়ে যায় এবং যারা আমাদের পিছু নিয়েছে তাদের গরম নিঃশ্বাস আমরা অনুভব করি। বিপ্লবী হিসেবে আমাদের উদ্দীপনার ফলে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এগোনোর চেষ্টা করি, পথ পরিষ্কার করে দিয়ে। কিন্তু আমরা জানি যে আমরা জনসাধারণ আমাদের পুষ্ট করে এবং তারা তখনই দ্রুত এগোতে পারবে যখন আমাদের দেখে তারা উৎসাহিত হবে।

যদিও নৈতিক উদ্দীপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবুও দুটো প্রধান যে বিভাজন থেকেই গেছে (অবশ্যই সেই সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে যারা যে কোনও কারণেই হোক সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে যোগ দেয়নি) তার কারণ সামাজিক সচেতনতার ততটা বিকাশ হয়নি। জনগণের থেকে ভ্যানগার্ডরা আদর্শের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। জনগণ নতুন মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু যথেষ্ট সচেতন নয়। ভ্যানগার্ডদের মধ্যে গুণগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে ভ্যানগার্ড হিসেবে তারা আত্মত্যাগ করতে পারে। সাধারণ মানুষ ছবির একটা অংশ দেখতে পায় মাত্র এবং তাদের আরও তীব্র উদ্দীপনা এবং চাপের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। সর্বহারার এই একনায়কতন্ত্র শুধু পরাজিত শ্রেণির ওপরেই নয়, বিজয়ী শ্রেণির ব্যক্তিদের ওপরেও কাজ করে।

এসবের অর্থ হল সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কিছু বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের কিছু ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিপুল সংখ্যক মানুষের ভবিষ্যতের দিকে মিছিল করে এগিয়ে যাওয়ার চিত্রের সঙ্গে আসে হরেক রকমের প্রণালী, পদক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ এবং মসৃণ প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানীকরণ। প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলাকে আরও সহজ করে, ভ্যানগার্ডের অংশ হিসেবে পথ চলার জন্য সহজাত অংশকে ভ্যানগার্ড হিসেবে চিহ্নিত করাকে আরও সহজ করবে, এবং যারা দায়িত্ব পালন করে তাদের পুরস্কৃত করবে এবং নতুন নির্মীয়মাণ সমাজের বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করবে তাদের শাস্তি দেবে।

বিপ্লবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

বিপ্লবের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভূক্তির কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। আমরা নতুন কিছুর খোঁজ করছি যা সরকার এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা তৈরি করবে, সমাজতন্ত্র গঠনের বিশেষ শর্তের জন্য যা উপযুক্ত। কিন্তু একই সঙ্গে যেটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আইন সভা জাতীয় সাধারণ স্তরগুলিকে সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া থেকে বর্জন করবে। এই অন্তর্ভূক্তির কাজে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু অকারণে তাড়াহুড়ো করা হয়নি। আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক হিসেবে কাজ করেছে এই ভয় যে কোনও ধরনের আনুষ্ঠানিকতা আমাদের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং যার ফলে চূড়ান্ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা থেকে আমাদের চোখ সরে যাবে, যেটি হলে বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষের মুক্তি।

প্রতিষ্ঠানের এই অভাবকে আস্তে আস্তে পূর্ণ করতে হবে কিন্তু এই ফাঁক থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখন সচেতন ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস রচনা করছে। সমাজতন্ত্রে মানুষ অনেক বেশি সম্পূর্ণ, যতই মানীকরণের অভিযোগ উঠুক না কেন। নিঁখুত পদ্ধতি না থাকলেও, নিজেকে প্রকাশ করার এবং সামাজিক জীবনে নিজেকে জাহির করার সুযোগ এখন অনেক বেশি।

পরিচালনা এবং উৎপাদনের সমস্ত কাঠামোতে ব্যক্তি এবং সমষ্টির সচেতন অংশগ্রহণ এখনো বাড়ানো প্রয়োজন। এবং এই ধারণাকে প্রায়োগিক এবং আদর্শগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি মানুষ বুঝতে পারে যে এই প্রক্রিয়াগুলি নিকটভাবে সম্পৃক্ত এবং তাদের অগ্রগতি সমান্তরাল। এইভাবে সামাজিক সত্বা হিসেবে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সচেতনতা লাভ করবে যা বিচ্ছিন্নতাবাদের শেকল ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সমান। স্বাধীন শ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজের আসল সত্বাকে নিজের মত করে নেওয়া এবং নিজের মনুষ্যত্বকে শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার মধ্যে এটা চালিত হবে।

কাজের নতুন ধরন

নতুন সংস্কৃতি তৈরি করতে হলে শ্রমকে পেতে হবে নতুন মান। পণ্য হিসেবে মানুষের অস্তিত্ব ঘুঁচে যাবে এবং একটা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে যা মানুষের সামাজিক কর্তব্য পালনের 'কোটা' প্রতিষ্ঠা করবে। উৎপাদনের উপকরণ রয়েছে সমাজের হাতে এবং যন্ত্র হল শুধু একটি ক্ষেত্র যেখানে কর্তব্য পালিত হয়। মানুষ নিজেকে সেই বিরক্তিকর ধারণা থেকে মুক্ত করতে আরম্ভ করবে যে শ্রমের মাধ্যমেই শুধু নিজের জান্তব চাহিদাগুলি পূরণ করা যায়। সে শ্রমের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে এবং সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে, কৃত কর্মের মধ্যে, মানুষ হিসেবে তার সম্পূর্ণ মর্যাদা বুঝতে পারবে। শ্রম মানে আর নিজেরই একটা অংশকে শ্রমশক্তি হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া নয়। শ্রম হয়ে উঠবে নিজের সত্বারই প্রকাশ, সাধারণ জীবনে তার অবদান যেখানে সে নিজেকেই দেখতে পাবে। শ্রম হবে তার সামাজিক কর্তব্য সাধন।

শ্রমকে সামাজিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এবং প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে তাকে যুক্ত করার জন্য যা যা সম্ভব তা আমরা করছি। এর ফলে আরও বেশি করে স্বাধীনতা পাওয়ার অবস্থা তৈরি হবে। এর সাথে থাকবে স্বেচ্ছায় শ্রম যার ভিত্তি হবে এই মার্ক্সবাদী চিন্তা যে মানুষ তার সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করে তখনই যখন নিজেকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করার শারীরিক তাগিদে সে আর উৎপাদন করতে বাধ্য হয় না।

অবশ্যই স্বেচ্ছা শ্রমের মধ্যেও কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মানুষ তার চারপাশের সমস্ত বাধ্য-বাধকতাকে সমাজ-সাপেক্ষ প্রতিফলনে রূপান্তরিত করতে পারেনি এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিবেশের চাপে পড়ে উৎপাদন করে। (ফিদেল একে নৈতিক বাধ্যতা বলেন)। নিজের শ্রমের প্রতি নিজের মনোভাবের একটা সম্পূর্ণ আত্মিক পুনর্জন্ম এখনো প্রয়োজন যা সামাজিক অবস্থার প্রত্যক্ষ চাপ থেকে মুক্ত

যদিও আবার নতুন অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে তার সঙ্গে যুক্তও বটে। এটাই হবে কমিউনিজ্‌ম।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমন চেতনার স্তরেও পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটে না। বদলগুলি আস্তে আস্তে ঘটে, একই ছন্দে নয়। মাঝে মাঝে লয় বেড়ে যায়, আবার কখনো কখনো গতি হয় শ্লথ, এমনকি পশ্চাদপসারণও লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া, আমি আগে যেমন বললাম, আমাদের মনে রাখতে হবে যে মার্ক্স 'ক্রিটিক অফ্ দ্য গোথা প্রোগ্রাম'-এ যে নির্ভেজাল রূপান্তরের চিত্র কল্পনা করেছিলেন, আমাদের কারবার সেরকম পর্ব নিয়ে নয়। বরং এমন একটা পর্ব নিয়ে যা তিনি আগে থেকে দেখতে পাননি। এই পর্ব হল কমিউনিজ্‌ম-এ রূপান্তরের গোড়ার পর্ব অথবা সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্ব। এই রূপান্তর ঘটছে হিংসাত্মক শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যে। এর মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদের বেশ কিছু উপকরণ যার ফলে এর নির্যাস অনেক সময় চাপা পড়ে যায়।

এর সঙ্গে যদি যুক্ত করি মধ্যযুগীয় দর্শন যা মার্ক্সবাদী দর্শনের বিকাশকে প্রতিহত করেছে এবং রূপান্তরের পর্ব, যার রাজনৈতিক অর্থনীতির এখনো বিকাশই ঘটেনি, তাকে নিয়ে পদ্ধতিগত ভাবে আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, তাহলে আমাদের একমত হতে হবে যে আমরা এখন শৈশবেই রয়েছি এবং আমাদের প্রয়োজন এই পর্বের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে তারপর বৃহত্তর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে বিশদে আলোচনা করা।

এর থেকে যে তত্ত্ব উঠে আসবে তা নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্র গঠনের দুটি স্তম্ভকে অগ্রাধিকার দেবে-নতুন মানুষ গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তির বিকাশ। উভয় ক্ষেত্রেই অনেক কাজ এখনো বাকি। তবে এর মধ্যে প্রচুক্তিকে মৌলিক ভিত্তি হিসেবে ভাবার ক্ষেত্রে আমাদের যে দেরি হয়েছে তার কোনও অজুহাত নেই কারণ এটা অন্ধের মত সামনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয় নয়, বরং পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির দেখিয়ে দেওয়া পথে হেঁটে যাওয়ার প্রশ্ন। এই কারণে ফিদেল আমাদের মানুষ এবং বিশেষ করে তার ভ্যানগার্ড অংশের প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের ওপর সবসময় এত বেশি জোর দেন।

স্বাতন্ত্র্যবাদ

ভাবনার যে ক্ষেত্র নিষ্ফল ক্রিয়াকলাপের দিকে যায় সেখানে বস্তুগত এবং আত্মিক প্রয়োজনের বিভেদ বেশি সহজে লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ সংস্কৃতি ও শিল্পের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। দিনের আট বা তার বেশি ঘন্টা ধরে পণ্য হিসেবে সে মরে যেতে থাকে, পরে তার আত্মিক সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সে আবার জন্মলাভ করে। কিন্তু এই ওষুধের মধ্যেও রয়েছে একই অসুখের জীবাণু-একাকী মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা। পরিবেশের দ্বারা অবদমিত নিজের ব্যক্তিসত্ত্বার হয়ে সে সালিশি করে এবং নান্দনিক ভাবনার

ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ও মৌলিক হতে চাওয়া এক ব্যক্তি হিসেবে সাড়া দেয়।

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। মূল্যের আইন শুধু আর উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিফলন নয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা অভিজ্ঞতাজনিত পদ্ধতি ব্যবহার কালেও এই আইনের চারপাশে এমন জটিল একটা কাঠামো তৈরি করে যে সে এক নিরীহ পরিচারককে পরিণত হয়। সুপারস্ট্রাকচার এমন একটা শিল্প চাপিয়ে দেয় যেখানে শিল্পীকে শিক্ষিত হতে হবে। যন্ত্র বিদ্রোহীকে চুপ করিয়ে দেয়। শুধু ব্যতিক্রমী প্রতিভাধারীরাই নিজের শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। বাকিরা পরিণত হয় লজ্জিত ঠিকা কর্মীতে অথবা চূর্ণ হয়ে যায়।

শৈল্পিক অনুসন্ধানের একটি স্কুল আবিষ্কার করা হয়েছে যা নাকি স্বাধীনতার সংজ্ঞায়িত রূপ। কিন্তু এই 'অনুসন্ধানের'ও সীমা রয়েছে যা বিরোধ না ঘটা অব্দি, অর্থাৎ মানুষ ও তার বিচ্ছিন্নতার আসল সমস্যাগুলি সামনে না আসা অব্দি, অদৃশ্য থাকে। অর্থহীন বেদনা এবং বীভৎস মজা তখন মানুষের উদ্বেগের 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ' হয়ে ওঠে। শিল্পকে প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহার করার ধারণার বিরোধিতা করা হয়।

যারা খেলার নিয়ম মেনে চলে তাদের সম্মানে ভরিয়ে দেওয়া হয়-একটা বাঁদর ঘুরে ঘুরে নাচ করলে যেমন সম্মান পায় আর কি। শর্ত হল আদৃশ্য খাঁচা থেকে যেন পালানোর চেষ্টা না করে।

শৈল্পিক অনুসন্ধানের নতুন প্রেরণা

বিপ্লব যখন ক্ষমতা পেল তখন যারা পোষ মেনেছিল তারা দলে দলে চলে যেতে আরম্ভ করল। বাকিরা, বিপ্লবী হোক আর না হোক, একটা নতুন পথ দেখতে পেল। শৈল্পিক অনুসন্ধান একটা নতুন স্পন্দন অনুভব করল। যদিও রাস্তাগুলো আগে থেকেই স্থির ছিল এবং পালিয়ে যাওয়ার ধারণা 'স্বাধীনতা' শব্দের পিছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। এই মনোভাব অনেক সময়ে বিপ্লবীদের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যা তাদের বুর্জোয়া ভাববাদী সচেতনতার প্রতিফলন।

যে সমস্ত দেশের এই ধরণের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেখানে এই প্রবৃত্তিগুলি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে মতবাদের গোঁড়ামি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ সংস্কৃতি প্রায় নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে মনে করা হয়েছে প্রকৃতির যথাযথ বর্ণন। তারা যে সামাজিক বাস্তবতা দেখাতে চেয়েছিল, পরবর্তীকালে এটাই তার যান্ত্রিক উপস্থাপনায় পরিণত হয়। আদর্শ যে সমাজ তারা তৈরি করতে চেয়েছিল-যেখানে প্রায় কোনও বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই।

সমাজতন্ত্রের বয়স এখনো কম এবং তার কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে। নতুন মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে পুরনো পন্থার বাইরে যাওয়ার জন্য যে জ্ঞান এবং সাহস প্রয়োজন, তা আমাদের, মানে বিপ্লবীদের অনেক সময়ে থাকে না এবং পুরনো পন্থাগুলির মধ্যে তারা যে সমাজে তৈরি হয়েছিল তার খারাপ প্রভাব থেকে যায়। (আবার ফর্ম এবং কন্টেন্টের সম্পর্কের বিষয়টির প্রসঙ্গ চলে এলো)। বিভ্রান্তি চারিদিকেই

রয়েছে এবং বস্তুগত নির্মাণের বিষয়টি আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। এমন কোনও শিল্পী নেই যিনি প্রবল কর্তৃত্বশালী এবং একই সঙ্গে প্রবল বিপ্লবী কর্তৃত্বও রয়েছে। পার্টির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের এই কাজটা নিজের হাতে তুলে নিতে হবে এবং মূল উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যা হল মানুষকে শিক্ষিত কোরে তোলা।

তার মানে যা খোঁজা হচ্ছে তা হলে সারল্য-এমন কিছু যা সবাই বুঝতে পাড়বে, যা কার্যনির্বাহকরা বুঝতে পারবে। আসল শৈল্পিক অনুসন্ধান বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণ সংস্কৃতির সমস্যা সমাজতান্ত্রিক বর্তমান এবং মৃত (অতএব বিপজ্জনক নয়) অতীতের থেকে নেওয়া কিছু উপকরণ নেওয়ায় গিয়ে ঠেকে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিজ্‌ম গত শতাব্দীর শিল্পের ভিতের ওপর তৈরি হয়।

উনিশ শতকের বাস্তবধর্মী শিল্পের কিন্তু একটা শ্রেণি চরিত্র ছিল। বিশ শতকের ডেক্যাডেন্ট শিল্প বিচ্ছিন্ন মানুষের যন্ত্রনাকে তুলে ধরে। সেই তুলনায় হয়তো উনিশ শতকের শিল্প আরও নির্ভেজাল ভাবে পুঁজিবাদী ছিল। সংস্কৃতির জগতে পুঁজিবাদের যা দেওয়ার ছিল সে দিয়েছে। পড়ে আছে শুধু একটা পচাগলা মৃতদেহের গন্ধ। আজকের শিল্পের ডেকাডেন্স। কিন্তু জমে বরফ হয়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিজ্‌ম-এর মধ্যেই কেন থাকবে একমাত্র বৈধ নিরাময়? সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিজ্‌ম-এর বিপরীতে আমরা 'স্বাধীনতা'কে বসাতে পারি না কারণ তার তো এখনো অস্তিত্বই নেই এবং যতক্ষণ না নতুন সমাজের বিকাশ ঘটছে ততদিন অব্দি তাকে পাওয়াও যাবে না। কিন্তু ধর্মযাজকের মত উচ্চাসনে বসে রিয়ালিজ্‌ম-ই শেষ কথা বলে আমরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু হওয়া সমস্ত শিল্পের অবমাননা করতে পারি না। কারণ তাহলে আমরা তাহলে প্রুঢনের মত অতীতে ফিরে যাওয়ার সেই একই ভুল করব। যে মানুষ সদ্য জন্মাচ্ছে এবং নিজেকে নির্মাণের প্রক্রিয়ায় রত হয়েছে তার শৈল্পিক প্রকাশকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখব। একট আদর্শগত-সাংস্কৃতিক পদ্ধতি দরকার যা স্বাধীন অনুসন্ধানের অনুমতি দেবে আবার রাষ্ট্রের ভর্তুকির উর্বর জমিতে যে আগাছা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তাকে উপড়েও ফেলবে।

আমাদের দেশে যান্ত্রিক রিয়ালিজে্মর সমস্যা আবির্ভূত হয়নি, বরং উল্টোটাই হয়েছে। এর কারণ হল নতুন মানুষ তৈরির প্রয়োজনীয়তাটা ঠিক মত বোঝা হয়নি। এমন এক নতুন মানুষ যে উনিশ শতকের ধারণার প্রতিনিধিত্বও করবে না আবার আমাদের এই ডেকাডেন্ট, বিষাদগ্রস্ত সময়ের প্রতিভূও হবে না। আমাদের তৈরি করতে হবে একুশ শতকের মানুষ যদিও এটা এখনো পর্যন্ত একটা বিষয়ীগত আকাঙ্ক্ষা, কোনও ব্যবস্থার মধ্যে একে আনা হয়নি। আমাদের কাজ এবং পর্যালোচনার একটি মূল বিষয়ই হল এটা। তাত্ত্বিক স্তরে আমরা যা সাফল্য লাভ করব, বা উল্টো দিকে, আমাদের কঠিন গবেষণার মধ্যে দিয়ে আমরা যে বৃ হৎ চরিত্র বিশিষ্ট তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হব-দুই ক্ষেত্রেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে আমাদের একটা মূল্যবান অবদান থাকবে। অবদান থাকবে মানুষের স্বার্থসিদ্ধির

লক্ষ্যে। উনিশ শতকের মানুষের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা বিশ শতকের ডেকাডেন্সের ফাঁদে পড়ে গেছি। এটা মারাত্মক ভুল নয়, তবে শোধনবাদের দরজা খুলে যাওয়ার আগে এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

বিপুল জনতার বিকাশ ঘটছে। নতুন ধারণাগুলি সমাজে ভালো গতিবেগ লাভ করছে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সংহত বকাশের বস্তুগত সম্ভাবনা এই কাজকে আরও বেশি করে ফলপ্রসূ করে তুলেছে। বর্তমান হল সংগ্রামের সময়। ভবিষ্যৎ আমাদের।

নতুন বিপ্লবী প্রজন্ম

শেষ করতে গিয়ে বলি, আমাদের অনেক শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবির ভুল আসলে তাদের আদি পাপের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তারা সত্যিকারের বিপ্লবী নয়। আমরা এল্ম গাছকে দিয়ে পিয়ার ফল ফলানোর চেষ্টা করে দেখতেই পারি, কিন্তু কয়েকটা পিয়ার গাছও আমাদের সেই সঙ্গে পুঁততে হবে। এই আদি পাপের থেকে মুক্ত নতুন প্রজন্ম আসবে। সংস্কৃতি এবং সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলে মহান শিল্পীদের আবির্ভাবের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের কাজ হল সংঘর্ষে জর্জ্জরিত বর্তমান প্রজন্মকে বিকারের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তারা যাতে পরবর্তী প্রজন্মের বিকারের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেই দিকে নজর দেওয়া। সরকারি বয়ান মাথা পেতে মেনে নেওয়া নিরীহ পরিচারক তৈরি করলে হবে না। তেমনি রাষ্ট্রের টাকায় জীবিকা নির্বাহ করা 'জলপাণি ছাত্র' তৈরি করলেও হবে না যাদের স্বাধীনতার ফলিত প্রকাশ শুধু নামেই। এমন বিপ্লবী আসবে যারা সাধারণ মানুষের গলায় নতুন মানুষের গান গাইবে। এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। আমাদের সমাজে যুবসমাজ এবং পার্টি বিরাট ভূমিকা পালন করে।

যুবসমাজ বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা হল সেই কাদামাটি যা দিয়ে কোনও ভুলত্রুটি ছাড়া নতুন মানুষ গড়া সম্ভব। যুবসমাজের প্রতি আচরণ আমাদের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রতিদিন তাদের শিক্ষা আরও সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং প্রথম থেকেই আমরা তাদের কাজে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি অবহেলা করি না। আমাদের বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্ররা তাদের ছুটিতে বা লেখাপড়ার পাশাপাশি কায়িক শ্রমও করে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে শ্রম পুরস্কার, কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু শাস্তি কখনোই নয়। একটা নতুন প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে।

পার্টি একটা ভ্যানগার্ড সংগঠন। সবথেকে ভালো কর্মীদের নিয়ে সেটা গঠিত। এদের নাম তাদের সহকর্মীরাই দিয়ে থাকেন। পার্টি সংখ্যালঘু, কিন্তু তার ক্যাডারদের গুণগত মানের কারণে তার প্রবল কর্তৃত্ব আছে। আমরা চাই পার্টি একটা গণ পার্টিতে পরিণত হোক, কিন্তু তখনই যখন সাধারণ মানুষ ভ্যানগার্ডের স্তরে এসে পৌঁছেছে, অর্থাৎ যখন তারা কমিউনিজ্মের জন্য শিক্ষিত হয়েছে। আমাদের কাজ সর্বদাই এই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পার্টি এর জলজ্যান্ত

উদাহরণ। তার ক্যাডাররা কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের নিদর্শন। তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষকে নিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী কাজ সম্পূর্ণ করার দিকে। নির্মাণের সমস্যার বিরুদ্ধে অনেক বছর ধরে কঠিন লড়াই করতে হবে, যুঝতে হবে শ্রেণি শত্রু এবং অতীতের অসুখ এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে...

ব্যক্তির ভূমিকা

সাধারণ মানুষ যে ইতিহাস রচনা করে সেখানে ব্যক্তি মানুষের নেতৃত্বের ভূমিকা আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা, কোনও ফর্মূলা নয়।

বর্তমানের মজুরিতে কত কিলোগ্রাম মাংস একজন খেতে পাচ্ছে, বছরে কতবার সমুদ্রে বেড়াতে যাচ্ছে, বিদেশ থেকে কটা সুন্দর জিনিস কিনে আনতে পারছে- বিষয়টা সেটা নয়। আসল ব্যাপার হল মানুষের নিজেকে আরও সম্পূর্ণ মনে হয়। তার অন্তরের ধন যেন বৃদ্ধি পায়। যেন বৃদ্ধি পায় দায়িত্ব। আমাদের দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে সে যে অপূর্ব সময়ের মধ্যে বেঁচে আছে তা হল আত্মত্যাগের সময়। সে আত্মত্যাগের সঙ্গে পরিচিত। প্রথম পরিচয় ঘটেছিল সিয়েরা মায়েস্ত্রতাতে যেখানে তারা লড়াই করেছিল; তারপর পুরো কিউবা সেটা জানতে পারে। কিউবা হল আমেরিকার ভ্যানগার্ড এবং সে একটি অগ্রণি স্থান অধিকার করে আছে কারণ লাতিন আমেরিকার মানুষকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছে।

দেশের ভেতরে নেতৃত্বকে নিজের ভ্যানগার্ডের ভূমিকা পালন করতে হয়। এটা বলতেই হবে যে আসল বিপ্লবে, যেখানে মানুষ কিছু পাওয়ার আশা না করে নিজের সব দিয়ে দেয় সেখানে ভ্যানগার্ডের ভূমিকা একই সঙ্গে অপূর্ব এবং পীড়াদায়ক।

মানুষের ভালোবাসা

যদিও হাস্যকর শোনাতে পারে, তাও বলি, আসল বিপ্লবীকে রাস্তা দেখায় ভালোবাসা। এই গুণ ছাড়া একজন খাঁটি বিপ্লবীকে কল্পনাই করা যায় না। হয়তো নেতার এই এক অদ্ভুত নাটকীয় জীবন যেখানে তাকে গাঢ় আবেগের সঙ্গে মেশাতে হয় হিমশীতল বুদ্ধি এবং একবারের অন্যেও শিউরে না উঠে নিতে হয় ভয়ানক সব সিদ্ধান্ত। আমাদের ভ্যানগার্ড বিপ্লবীদের মানুষের এই ভালোবাসাকে, লক্ষ্যের প্রতি এই ভালোবাসাকে, আদর্শ হিসেবে দেখতে হবে এবং দুটোকে এক করে অদৃশ্য করে দিতে হবে। যেখানে সাধারণ মানুষ তার প্রেমকে ক্রিয়ায় প্রকাশ করে, প্রতিদিনের ছোট ছোট স্নেহের মধ্যে দিয়ে তারা সেই স্থানে নেমে আসতে পারবে না।

অনেক বিপ্লবীদের সন্তানরা কথা বলতে শিখেছে, কিন্তু 'বাবা' শব্দটা এখনো জানে না। বিপ্লবকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে বিপ্লবীদের স্ত্রীদেরও আত্মত্যাগের অংশ হতে হবে। তাদের বন্ধুরা হবে শুধু বিপ্লবের কমরেডরাই। এর বাইরে কোনও জীবন থাকবে না।

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনেকটা মনুষ্যত্ব, ন্যায়ের বোধ। নইলে মতবাদের

গোঁড়ামির, শীতল শিক্ষানবিশি, অথবা জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফাঁদে পা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের প্রতি দিন সংগ্রাম করতে হবে যাতে এই জীবন্ত মনুষ্যত্বের ভালোবাসা পরিণত হয় কঠিন কীর্তিতে। এমন কীর্তি যা নিদর্শন হিসেবে, চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিপ্লবী হল তার পার্টির মধ্যে আদর্শের ইঞ্জিন এবং আমৃত্যু তাকে এই ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে যদি না সারা পৃথিবীতে তার মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি নিজের জায়গায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার বিপ্লবী উদ্দীপনা ভোঁতা হয়ে যায়, যদি সে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা ভুলে যায় তাহলে সে যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে তা ঝিমিয়ে পড়বে এবং আমাদের অপরিবর্তনীয় শত্রু সাম্রাজ্যবাদ তার সুযোগ নিয়ে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করবে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ একটি কর্তব্য, কিন্তু সেটা একটা বিপ্লবের একটি অপরিহার্য অংশ। আমাদের জনগণকে আমরা এই শিক্ষা দিয়ে থাকি।

মতান্ধতার বিপদ

অবশ্যই বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপদ রয়েছে। শুধু মতবাদের গোঁড়ামিরই নয় অথ বা মাঝপথে এসে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক শীতল হয়ে যাওয়ার বিপদ নয়। রয়েছে দুর্বলতার বিপদ। যদি কেউ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনে করে যে তার প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা, যেমন তার সন্তানদের অভাব, তাদের ক্ষয়ে যাওয়া জুতো, তার পরিবারের কোনও প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব থেকে সে মুক্ত, তাহলে ভবিষ্যতে দুর্নীতির দরজা খুলে দেওয়া হবে। আমরা মনে করি যে আমাদের সন্তানদের সেই জিনিস থাকবে বা থাকবে না যা সাধারণ মানুষের সন্তানদেরও থাকে অথবা থাকে না। আমাদের পরিবারকে এটা বুঝতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে যাতে এমনটাই হয়। মানুষের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব হয়, কিন্তু মানুষকে তার বিপ্লবী সত্ত্বাকে প্রতিদিন গড়েপিটে নিতে হবে।

অতএব আমরা এগিয়ে চলেছি। এই বিপুল স্তম্ভের পুরোভাগে রয়েছেন ফিদেল-এ কথা বলতে আমরা ভীত বা লজ্জিত নই। তাঁর পরে আছে পার্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাডারের দল, আর তাদের ঠিক পরেই রয়েছে সাধারণ মানুষ এত কাছে যে তাদের প্রবল শক্তি আমরা অনুভব করতে পারি। একদল মানুষ যারা একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, যারা আবশ্যকতা থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেই নিজেকে সংগঠিত করে নেয়। সংগঠিত হওয়ার আবশ্যকতা সে অনুভব করে বলেই এটা সম্ভব হয়। এ আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোনও শক্তি নয় যাকে একটা হ্যান্ড গ্রেনেডের মত টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়। যে যে কোনও উপায় তার স্তরে থাকা মানুষের সঙ্গে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার লড়াই করছে।

আমরা জানি যে সামনে রয়েছে আরও আত্মত্যাগ। আমরা জাতি হিসেবে

ভ্যানগার্ড-এর মূল্য আমাদের চোকাতে হবে আমরা জানি। নেতা হিসেবে আমরা জানি যে আমেরিকার মাথায় থাকা মানুষের নেতা হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করার অধিকারের মূল্য আমাদের চোকাতে হবে। আমরা প্রত্যেকে তৎপর হয়ে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে থাকি কারণ আমরা জানি যে পুরস্কার হিসেবে আছে কর্তব্য পালনের আনন্দ। আমরা জানি সবার সঙ্গে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেই নতুন মানুষের দিকে যার ঝলক দিগন্তে দেখা যাচ্ছে।

কয়েকটা সিদ্ধান্তবাক্য

আমরা, সমাজতান্ত্রিকরা, বেশি স্বাধীন, কারণ আমরা বেশি পরিপূর্ণ; আমরা বেশি পরিপূর্ণ কারণ আমরা বেশি স্বাধীন।

আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার কঙ্কাল তৈরি হয়েই আছে। মাংস এবং পোশাক বাকি। আমরা তা তৈরি করে নেব।

আমাদের স্বাধীনতা এবং প্রতিদিনের রসদের রঙ রক্তের মত লাল। তা আত্মত্যাগে ভরা।

আমাদের আত্মত্যাগ সচেতন। যে স্বাধীনতা আমরা তৈরি করছি তার কিস্তি দেওয়া।

পথ দীর্ঘ এবং অনেকাংশে অচেনা। আমাদের সীমাবদ্ধতা আমরা জানি। আমরাই একুশ শতকের মানুষ নির্মাণ করব।

প্রতিদিনের কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের গড়ে তুলব, নতুন প্রযুক্তি দিয়ে নতুন মানুষ তৈরি করব।

ব্যক্তি ততদূর পর্যন্ত জনগণের চালিকাশক্তি এবং নেতা হিসেবে কার্যকরী যতদূর পর্যন্ত সে এই মানুষের সর্বোচ্চ গুণাবলী এবং আকাংক্ষার মূর্ত রূপ এবং এই পথের পথিক।

পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে ভ্যানগার্ড, ভালোর মধ্যেও যারা শ্রেষ্ঠ, পার্টি।

আমাদের কাজের প্রধান মাটি হল যুবসমাজ। তারাই আমাদের আশা, আমাদের হাত থেকে পতাকা নেওয়ার জন্য আমরা তাদের প্রস্তুত করছি।

এই অসংলগ্ন চিঠি যদি কোনও বিষয় পরিষ্কার করে থাকে তাহলে যে লক্ষ্যের দ্বারা সে চালিত, সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

আমাদের আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন, যেটা কিছুটা করমর্দন বা 'আভে মারিয়া পুরিসিমা'র মতো-পাত্রিয়া ও মুয়ের্তে [স্বদেশ অথবা মৃত্যু!]

★

আর্নেস্তো চে গুয়েভারার

বিপ্লবী জীবনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৪ জুন ১৯২৮:	জন্ম, আর্জেন্টিনার রোজারিওতে।
১৯৫৩:	চে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে উত্তীর্ণ হন।
৭ জুলাই ১৯৫৩-১৯৫৪:	লাতিন আমেরিকা জুড়ে ভ্রমণ করার পরে তিনি ১৯৫৩ সালে গুয়াতেমালায় পৌঁছান, যেখানে তিনি কিউবার নির্বাসিতদের একটি দলের সাথে দেখা করেন যারা তাঁকে চে হিসাবে নামাঙ্কিত করে। তিনি জ্যাকোবো আরবেনজের বিরুদ্ধে সিআইএ সংগঠিত অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করেন।
১৯৫৫ সালের জুলাই:	চে, ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে সাক্ষাত করেন এবং ফুলজেনসিও বাতিস্তার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ২৬ জুলাই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
২৫ নভেম্বর ১৯৫৬:	ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে, চে এবং অন্য ৮১ জন পুরুষ কিউবার সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতমালায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে 'গ্রানমা' জাহাজে আরোহণ করেন।
২১ জুলাই ১৯৫৭:	চে কমান্ডারে পদোন্নতি পান। তিনি 'সিরো রেডন্ডো' অষ্টম কলামে নেতৃত্ব দিতে যান।
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮:	চে কর্তৃক নির্মিত 'রেডিও রেবেল্ড' এর প্রথম সম্প্রচার।
২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৮:	চে সান্তা ক্লারার যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এটি ছিলো বাতিস্তার বিপক্ষে চূড়ান্ত ধাক্কা।
৩ জানুয়ারী ১৯৫৯:	ভোরবেলা বিপ্লবের বিজয়োল্লাসের সাথে চে হাভানায় উপস্থিত হন। ফিদেল তাকে লা কাবানার সামরিক দূর্গ দখল করার দায়িত্ব দেন।
১২ জুন ১৯৫৯:	চে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, যুগোস্লাভিয়া, মায়ানমার, জাপান, পাকিস্তান, সুদান এবং মরক্কোতে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি কিউবান

	প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।
৭ অক্টোবর ১৯৫৯:	চে ভূমি সংস্কারের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শিল্পায়ন বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।
২৬ নভেম্বর ১৯৫৯:	চে কিউবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক অফ কিউবার' সভাপতি নিযুক্ত হন।
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১:	চে শিল্পমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
১১ ডিসেম্বর ১৯৬৪:	চে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন।
জানুয়ারি - মার্চ ১৯৬৫:	চীন, মালি, কঙ্গো, গিনি, ঘানা, দাহোমেই, তানজানিয়া, মিশর, আলজেরিয়ার সরকার প্রধান এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের সাথে বৈঠক।
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫:	আলজেরিয়ায় চে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সংহতি সভায় বক্তব্য রাখেন।
১ এপ্রিল ১৯৬৫:	কঙ্গোর বিপ্লবী সংগ্রামে লরেন্ট কাবিলার গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে চে ছদ্মবেশে কিউবা ছাড়েন।
২১ নভেম্বর ১৯৬৫:	কঙ্গো এবং অভিযানের ব্যর্থতায় প্রায় সাত মাস পর চে তানজানিয়া চলে গেলেন, যেখানে তিনি বেশ কয়েক সপ্তাহ গোপনে অবস্থান করেন। ডিসেম্বরের শেষে তিনি চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি বেশ কয়েক মাস গোপনেই থাকতেন।
৩ নভেম্বর ১৯৬৬:	চে বলিভিয়ার নিয়ানকাহুয়াসু এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতে আসেন।
৮ অক্টোবর ১৯৬৭:	কুইব্রাদা দেল ইউরোতে সিআইএর পরামর্শে বলিভিয়ার সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধের সময় তাকে বন্দী করা হয়।
১৯ অক্টোবর ১৯৬৭:	দুপুর দেড়টায় লা হিগুয়েরা শহরের একটি ছোট্ট স্কুলে সার্জেন্ট মারিও টেরেন তাঁকে হত্যা করে।

Batalla de Ideas (Argentina)
www.batalladeideas.com.ar

Bharathi Puthakalayam (India)
www.thamizhbooks.com

Chintha (India)
www.chinthapublishers.com

Deshar Katha (India)

Editorial Caminos (CMMLK, Cuba)
ww.ecaminos.org

El Colectivo (Argentina)
www.editorialelcolectivo.com

Expressao Popular (Brazil)
www.expressaopopular.com.br

Fondo Editorial Fundarte (Venezuela)
www.fundarte.gob.ve

Gonoprokashon (Bangladesh)

Simón Bolívar Institute (Venezuela)
www.isb.ve

Janashakti Prakashan (India)

Kriya Madyama (India)

LeftWord (India)
www.mayday.leftword.com

Naked Punch (Pakistan)
www.nakedpunch.com

Nava Telangana (India)
www.navatelanganabooks.com

Ojas: Vidyarthi Ni Pahel (India)

Prajasakti (India)
www.psbh.in

Tricontinental. Institute of Social Research
www.thetricontinental.com

Vam Prakashan (India)
mayday.leftword.com/vaam-prakashan/

Založba /*cf (Slovenia)
www.zalozbacf.si